উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

দ্বিতীয় সেমেস্টার

উপন্যাস (উনিশ-বিশ শতক)

ঐচ্ছিক পত্র – ২০৫

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক ১ চন্দ্রশেখর- প্রেক্ষাপট ও উপন্যাসের গঠন

একক ২ চন্দ্রশেখর- উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ

একক ৩ চন্দ্রশেখর- উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা

একক ৪ চন্দ্রশেখর- উপন্যাসের নিয়তির ভূমিকা ও অলৌকিকতার পরিচয়

একক ৫ ঘরে বাইরে- ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

একক ৬ ঘরে বাইরে- উপন্যাসের চরিত্র

একক ৭ ঘরে বাইরে- উপন্যাসের রাজনৈতিক সত্য

পর্যায় খ

একক ৮ পুতুল নাচের ইতিকথা- ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

একক ৯ পুতুল নাচের ইতিকথা- চরিত্র চিত্রণ

একক ১০ পুতুল নাচের ইতিকথা- উপন্যাসে কুসুমের মনস্তত্ত্ব

একক ১১ পুতুল নাচের ইতিকথা- কুমুদ মতি উপাখ্যান

একক ১২ আরোগ্য নিকেতন- উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও গঠন

একক ১৩ আরোগ্য নিকেতন- চরিত্র-চিত্রন

একক ১৪ আরোগ্য নিকেতন- নামকরণ

মন্তব্য

ঐচ্ছিক পত্র–২০৫ – উপন্যাস (উনিশ-বিশ শতক)

পর্যায় ক

একক ১। চন্দ্রশেখর- প্রেক্ষাপট ও উপন্যাসের গঠন - ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত, রচনাকাল, সামাজিক পটভূমি, উপন্যাসের গঠন, উপন্যাসের পটভূমি, উপক্রমণিকা অংশের তাৎপর্য, ভাষারীতি, বর্ণনা রীতি।

একক ২। চন্দ্রশেখর- উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ - মুখ্য চরিত্র, গৌণ চরিত্র।

একক ৩। চন্দ্রশেখর- উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা - দুই কাহিনীর ঐক্য স্থাপনে সার্থকতা, আধুনিক উপন্যাসের সার্থকতা, প্রায়শ্চিত্ত পর্বের ব্যর্থতা।

একক ৪। চন্দ্রশেখর- উপন্যাসের নিয়তির ভূমিকা ও অলৌকিকতার পরিচয়- শৈবলিনী মৃত্যু ও নবজীবন লাভ, ট্রাজেডির আলোকে উপন্যাস, শৈবলিনীর দুর্ভাগ্যের কারণ।

একক ৫। ঘরে বাইরে- ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত - রচনাকাল, সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি, উপন্যাসের গঠনরীতি, উপন্যাসের সমাজনীতি, উপন্যাসের রাজনীতি প্রসঙ্গ।

একক ৬। ঘরে বাইরে- উপন্যাসের চরিত্র – নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ, মেজবউরাণী, চন্দ্রনাথবাবু, অমূল্যচরণ।

একক ৭। ঘরে বাইরে- উপন্যাসের রাজনৈতিক সত্য - উপন্যাসের রাজনৈতিক সত্য ও প্রেমের সত্য একই সূত্রে গাঁথা, নামকরণ, উপন্যাসের প্রেম চেতনা, বিমলার মনস্তত্ত্ব।

একক ১ চন্দ্রশেখর প্রেক্ষাপট ও উপন্যাসের গঠন

বিন্যাসক্রম

১.১ ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

১.২ রচনাকাল

১.৩ সামাজিক পটভূমি

১.৪ উপন্যাসের গঠন

১.৫ উপন্যাসের পটভূমি

১.৬ উপক্রমণিকা অংশের তাৎপর্য

১.৭ ভাষারীতি

১.৮ বর্ণনা রীতি

১.৯ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৮-৯৪)।তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের নানা ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখেছেন।'চন্দ্রশেখর'-ও তার মধ্যে একটি বিখ্যাত উপন্যাস।এটি তাঁর লেখা সপ্তমতম উপন্যাস। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস টি লেখেন।"চন্দ্রশেখর" এর মতো উপন্যাস তিনি আরও অনেক গুলো রচনা করেছেন ইতিহাস ও রোমান্সকে আশ্রয় করে।

"দুর্গেশনন্দিনী", "কপালকুণ্ডলা", "মৃণালিনী" "রাজসিংহ" উপন্যাস গুলি এই পর্যায়ে পড়ছে।এছাড়াও তিনি "বিষবৃক্ষ" "ইন্দিরা" "আনন্দমঠ" "দেবী চৌধুরানী" ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেছেন।বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ রূপকার এবং তাঁর হাতে বাংলা উপন্যাস এক নতুন যুগের সূচনা হয়।বিষয়ের নতুনত্বে,রচনা প্রকরণে,জীবন দর্শনে,তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি আজও অতুলনীয়।ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পথ ছেড়ে শাখা পথে অগ্রসর হয়েছেন শরৎচন্দ্র তাঁর পথ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে বরং বিপরীত পথে যাত্রা করেছেন কিন্তু তাঁকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।...বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশাল হিমালয়ের মতো বাংলা উপন্যাসের শীর্ষ দেশে দাঁড়িয়ে আছেন তা অস্বীকার করা যায় না"।

১.২ রচনাকাল

১৮৭৫ -এ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটি রচনা করেন।

১.৩ সামাজিক পটভূমি

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা সমস্যা জটিল উউপন্যা ‘চন্দ্রশেখর’ লেখা হয়েছিল ১৮৭৫ সালে। ১৮২০সালে উপন্যাসটি বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। বাংলার জনজীবনে সেই সময় টি অত্যন্ত সংকটময়। ইংরেজ শাসনের অত্যাচারে মানুষের জীবন তখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন ইংরেজ শাসনের সংকটময় পরিস্থিতিকে তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

১.৪ উপন্যাসের গঠন

‘চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটি বিভিন্ন খন্ড ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছে।খণ্ড সংখ্যা ছয়টি, এবং তা বিভিন্ন পরিচ্ছদে বিভক্ত। প্রথম খন্ডের পরিচ্ছেদ সংখ্যা পাঁচ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডের পরিচ্ছেদ সংখ্যা আট, চতুর্থ ও পঞ্চম খন্ডের পরিচ্ছেদ সংখ্যা চার এবং ষষ্ঠ খন্ডের পরিচ্ছেদ সংখ্যা আট। প্রতিটি খন্ডের তাৎপর্যজ্ঞাপক একটি নাম বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। আবার পরিচ্ছেদ সমূহের নাম বিষয়বস্তু অনুযায়ী চিহ্নিত হয়েছে।

এছাড়াও উল্লেখ্য উপন্যাসের শুরুতেই একটি উপক্রমণিকা অংশ রয়েছে। উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশে তিনটি পরিচ্ছেদে শৈবলিনী ও প্রতাপের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নিমজ্জিত প্রতাপ কে চন্দ্রশেখর উদ্ধার করেন এবং তিনি শৈবলিনীর রূপ দর্শনে ও তাঁর জননীর অনুরোধে তাঁকে বিবাহ করেন ।প্রতাপ ও পরে রূপসীকে বিবাহ করেন। কিন্তু জাগ্রত সুমধুর স্বপ্নের মতো বাল্য প্রনয়ের স্মৃতি তাদের মধ্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে। 'বঙ্গদর্শন'-এ এই তিনটি পরিচ্ছেদ একটি পরিচ্ছেদ এর অন্তর্ভুক্ত এর নাম ছিল 'পূর্ব কথা'।

উপন্যাসের প্রথম খন্ডের নাম 'পাপীয়সী'। চন্দ্রশেখর ন্যায় রূপবান তত্ত্বজ্ঞ এবং সহযোগী পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হলেও এবং আট বছর বিবাহিত জীবন যাপন করলেও শৈবলিনী বাল্য প্রনয়ের অনুরাগ ভুলতে পারেনি।তবে এই খন্ডের নামটি বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক দৃষ্টিকে ব্যক্ত করেছে এর ফলে তাঁর শিল্পীসুলভ নির্লিপ্ততা ব্যক্ত হয়নি।

দ্বিতীয় খন্ডের নাম হলো 'পাপ'। এই খন্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ এর 'বজ্রাঘাত' ও অষ্টম পরিচ্ছেদ এর 'পাপের বিচিত্র গতি' নামক দুটি অধ্যায়ে শৈবলিনী প্রতাপ কে তার আবেগপূর্ণ হৃদয়ের গভীর অনুরাগের কথা জানিয়েছে। পাপী রূপে শৈবলিনীর পরিচয় দান বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী মনের পরিচায়ক নয়।যদি শৈবলিনী পাপী সাব্যস্ত হয় তবে প্রতাপকে পুণ্যাত্মা বলা চলে না। কারণ তার মধ্যেও বাল্য প্রণয়ের স্মৃতি জাগ্রত আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ এ শৈবলিনীর স্বপ্নদর্শন রূপকের আকারে বর্ণিত হয়ে তার মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

তৃতীয় খন্ডের নাম 'পুণ্যের স্পর্শ'। এই খন্ডের বিষয়বস্তু হল শৈবলিনীর কৌশলে প্রতাপের মুক্তি উভয়ের গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ এবং শৈবলিনী কঠোর শপথ বাক্য উচ্চারণ। এই খন্ডে শৈবলিনীর মানসিক প্রায়শ্চিত্ত ব্যাখ্যাত হয়েছে হয়েছে।

চতুর্থ খন্ডে তার প্রায়শ্চিত্ত পর্ব বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে। রামানন্দ স্বামীর নির্দেশে সে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় ব্রতী হয়েছে। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় নরক দর্শনের ভীতির কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

পঞ্চম খন্ডের নাম হল 'প্রসাধন'। শব্দটির তাৎপর্য হলো যে মূল কাহিনী কে আচ্ছাদিত রেখে গৌণ কাহিনীর বর্ণনা।এই খন্ডে মূলত দলনী বেগমের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে।তার কাহিনী ষষ্ঠ খন্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সমাপ্তি লাভ করেছে।

ষষ্ঠ খন্ডের নাম হল 'সিদ্ধি'। রামানন্দ স্বামী তার যোগবলে শৈবলিনী কে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে তাকে চন্দ্রশেখরের গৃহে দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শৈবলিনী এবং ফষ্টর তাদের সকল কথা জানিয়েছে, শৈবলিনী যে নিষ্পাপ এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাকে করবো না আর কোন বাধা ছিল না। এই খন্ডে নবাবের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।রাজ্য হারানোর দুঃখ অপেক্ষা দলনী বেগমের শোক তাকে বেশি আহত করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে রূপকের ব্যবহার করেছেন।বজরায় শৈবলিনী স্বপ্ন দেখেছিল যে সে যেন একটি পদ্ম। সরোবরে প্রান্তে এক সুবর্ণ নির্মিত রাজহংস খেলা করে বেড়াচ্ছে। যখন রাজহংস কে সে ধরতে চেয়েছে ,তখন সে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে নদী তীরে একটি শূকর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মুখ ফষ্টরের মতো।শূকর তাকে প্রলুব্ধ করেছে ও হাঁস ধরে দেবার কথা বলেছে।

চতুর্থ খন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ- এ শৈবলিনী দেখেছে যে সে নরকে নিমজ্জিতা। সর্প সমূহ ফণা বিস্তার করে তাকে ঘিরে ধরেছে।চন্দ্রশেখর একটি বৃহৎ সাপের ফণায় চরণ স্থাপন করে দাঁড়ালেন।তখন সর্প সমূহ বন্যার জলে সরে গেল। অনন্ত কুন্ডে পর্বতাকার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে শৈবলিনী দগ্ধ হচ্ছে।চন্দ্রশেখর এক গন্ডুষ জল নিক্ষেপ করায় অগ্নি নির্বাপিত হলো।চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে সর্পরূপী প্রতাপ শৈবলিনীরূপী ব্যাঙকে গিলে ফেলল।এ দৃশ্য যখন সে দেখে তখন সে অপ্রকৃতিস্থা।

রোমান্সের ব্যবহার উপন্যাসের নানা স্থানে আছে। বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য হল গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ শৈবলিনী সন্তরণ দৃশ্য। সৌন্দর্য ও মাধুর্যে এই দৃশ্যটি জারিত।এই দৃশ্যে উভয়ে তাদের মনের কথা গভীর সুরে ব্যক্ত করেছে।কিন্তু তারপরে শৈবলিনী জীবনে নেমে এসেছে কঠোর আঘাত। শৈবলিনী প্রতাপ কে ভুলবার সংকল্প বাক্য উচ্চারণের পরেই "প্রাণ ভয়ে শৈবলিনী সুখ সৌন্দর্য প্রণয়াদি-পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল"।

এই দৃশ্যের নাট্য চাতুর্য বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়।নাট্যকলা কৌশল সমন্বিত আরো দু একটি দৃশ্য উপন্যাসে পাওয়া যায়। যেমন প্রতাপের গৃহে শৈবলিনীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন এবং দরবার দৃশ্যে যোগবলের কারণে ফষ্টরের স্বীকারোক্তি।

উপন্যাসের নিয়তির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।সেই সঙ্গে অলৌকিকতার অবতারণাও বিশেষ লক্ষ্যণীয়।'বিষবৃক্ষ'-এ কুন্দের স্বপ্ন বৃত্তান্ত এবং 'রজনী' উপন্যাসে সন্ন্যাসীর কৃপায় অন্ধ রজনীর দৃষ্টি লাভ অলৌকিকতার পরিচয় দেয় আর 'চন্দ্রশেখর'-এ রমানন্দ স্বামীর যোগবল ও তার অলৌকিক কার্যকলাপ আমাদের বিস্মিত করে।অবশ্য এর ফলে উপন্যাসের বাস্তবধর্ম ক্ষুন্ন হলেও রোমান্সের রস আমাদের মুগ্ধ করে।যোগবল প্রভাবে শৈবলিনীর নিষ্পাপতা প্রমাণিত হয়। নিয়তির এক নির্মম ভূমিকা আমরা নিরপরাধা ও পতিব্রতা দলনীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি।শোকাবহ পরিণাম আমাদের মনকে জগতের নৈতিক বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর করে তোলে।

এই গ্রন্থেও অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র নৈতিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন।রামানন্দ স্বামী তার শিষ্য চন্দ্রশেখরকে বলেছেন যে দুঃখ বলে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নেই।সুখ ও দুঃখ বিজ্ঞ লোকের নিকটে একই। দেবলোকও দুঃখে পরিপূর্ণ। যিনি দয়াময় তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্তকাল দুঃখী, নয়তো তিনি দয়াময় নন।তিনি বলেছেন যে একমাত্র পরোপকারই সংসারে সুখী।এই তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর' এও ব্যাখ্যা করেছেন।

১.৫ উপন্যাসের পটভূমি

সাধারণত ইতিহাস বলতে বোঝায় "Methodical records of public events,past events", অর্থাৎ যা পূর্বে সংঘটিত তাই ইতিহাস যে ঘটনা ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারত অর্থাৎ যা পরিকল্পিত তা উপন্যাসের বিষয় হতে পারে এই দুয়ের সমীকরণে তৈরি হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস।তবে ইতিহাসের বাস্তব এবং উপন্যাসের বাস্তব এক রকম নয়। অতীতকালের আশ্রয় হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক এর দায়িত্ব হবে ইতিহাসের ঘটনা কে পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত করে তোলা। ইতিহাসের বাস্তবকে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করে তুলবে উপন্যাসের বাস্তব এবং রাষ্ট্রীয় সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েই তা পুরোনো রূপ পাবে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনী রচনা করে না, শুধু তথ্যের সমাবেশ ঐতিহাসিক বিতর্ক সেখানে বড় কথা নয়,রক্তমাংসের সজীব মানুষ কে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থান দেওয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষ্য।

M.H.Abrams প্রদত্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা এরূপ

"The historical novel take it settings and some of its character and events from history, the term is usually applied only if the historical event are fairly, elaborately devolop,and impart to the central narrative." [A glossary of leterary terms].

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভিত্তি গড়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে।ইতিহাসের রোমান্স কে তিনি পারিবারিক প্রসঙ্গের সঙ্গে সুকৌশলে সংগ্রথিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে চন্দ্রশেখর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।১৮৭৫-এ বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস রচনা করেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে একমাত্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। অধিকাংশ উপন্যাসেই ঐতিহাসিক উপকরণ গ্রহণ করেছেন।তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রধান কাহিনী এবং সীতারাম উপন্যাসের প্রধান কাহিনীর বহিরঙ্গন রেখাটি ইতিহাস কল্পনা পূর্ণতা লাভ করেছে।কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী ঐতিহাসিক পরিবেশ কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'আনন্দমঠ'-এ ইতিহাস

পরিবেশই প্রধান হয়ে উঠেছে, তুলনায় ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিবেশন কিছুটা কম।প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর-এর পারিবারিক সামাজিক জীবন কথা রুপায়নই উপন্যাসের মূল লক্ষ্য ছিল।ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ এসেছে মীর কাসেম ও দলনীর কাহিনীকে কেন্দ্র করে। মীর কাসেম দলনীর ইতিহাস প্রসঙ্গ তাদের জীবন সমস্যার সঙ্গে বিজারিত হয়েছে।

দলনী উপাখ্যান অর্ধ-ঐতিহাসিক,অর্ধ-কাল্পনিক।তারই আশ্রয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশেম ইংরেজ দ্বন্দ্বে ঐতিহাসিক পটভূমি ও রাজনৈতিক আলোড়ন এর পরিবেশ চিত্র অঙ্কন করেছেন। ‘চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের বিজ্ঞপ্তি অংশে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছেন----

“ইহাতে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে তাহার কোন কোন কথা সচারাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বাঙালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না “সয়েল-উল-মতাক্ষরীন্” নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে ঐতিহাসিক বিষয়ে কোথাও কোথাও ওই গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়াছি।” তবুও দলনীর উপাখ্যানটি কে যথার্থ ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

ঐতিহাসিক রবার্টস এর বিবরণী থেকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীর কাশেমের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় উপন্যাস মধ্যে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত আলোড়ন এবং ইতিহাস ভিত্তিক ঘটনা মাত্র বিক্ষোভ চাঞ্চল্যের যে বিবরণী ও বর্ণনা পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে ইতিহাস সম্মত। উপন্যাসে এর সাক্ষ্য আমরা পাই মীর কাশেমের উক্তিতে-- “ইংরেজরা যে আচরণ করিতেছেন তাহাতে তাহারাই রাজা। আমি রাজা নই।যে রাজ্যে আমি রাজা নই সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন কেবল তাহাই নয়,তাহারা বলেন রাজা আমরা কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর।তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন করো। কেন আমি তাহা করিব?যদি প্রজাহীতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব।অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইবো?আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি বা মীরজাফর নহি।”

এখানে এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশেমের দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ কি,বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিমের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ইতিহাস সঙ্গত কারণ কি এখানে প্রকাশ করেছেন। পাটুরিয়া উদয় মেলায় ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রামে মীর কাসেম যে পরাজয় বরণ করেছেন তাও ইতিহাস সম্মত প্রসঙ্গ।

অ্যাখানে উপস্থিত চরিত্রের মধ্যে মীর কাসেম,আলি ইব্রাহিম,গুর্গণ খাঁ,আমিয়ট,হেস্টিংস এরা ইতিহাস পরিচিত ব্যক্তিত্ব।সেনাদলের পরিচালনায় সমরু নামটি পাওয়া গেলেও এর প্রকৃত নাম ওয়ালটর রাইন। তিনি যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন সেনাদলের উপর গুর্গণ খাঁ-এর প্রভাব ও বিশ্বাসঘাতকতা,নবাবের প্রতি ইব্রাহিম এর আনুগত্য, হেস্টিংস এর যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা, আমিয়টের কর্মতৎপরতা,অসম সাহসী মনোভঙ্গি ইতিহাস ভিত্তিক।তবে এই সমস্ত চরিত্রের উপস্থাপনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোচ্চ যথাযথভাবে ইতিহাসেরই অনুকরণ করেছেন এমন নয়।কোথাও কোথাও তিনি কল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করেছেন তবে কখনোই তিনি "Law of probability and necessity"-র গন্ডিকে অতিক্রম করেনি কারণ উপন্যাস উপন্যাসই,ইতিহাস নয়।

বাংলাদেশের ইতিহাস এই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে এক ক্রান্তি লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে কোন দিকে ঘটনাবলী পরিবর্তিত হতে পারে। নবাবী শাসন স্থায়ী হবে কিনা এই নিয়ে এক অনিশ্চয়তা ও মানসিক অস্থিরতা বোধ রাজকর্মচারী এমনকি সাধারণ মানুষদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। জাতীয়তা বোধ ইংরেজদের মধ্যে ছিল।তাদের বিশ্বাস গভীর ছিল যে তাদের প্রাণ দানে ভারতবর্ষে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা উড্ডীন হবে।তাদের বক্তব্য কত আন্তরিক ছিল তার প্রমাণ আমরা আমিয়ট,গলষ্টন,জনসনের যুদ্ধে নির্ভীকভাবে মৃত্যু বরণ এর মধ্যে দেখি।কিন্তু নবাবের অনুচর গণের মধ্যে এই জাতীয় দেশ চেতনা ছিল না তাদের আনুগত্য ছিল নবাবের প্রতি।কেননা তারা বেতনভুক কর্মচারী বা সৈনিক।প্রতাপ নবাবের পক্ষে যোগদান করে বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল ফস্টার কে শাস্তি দান।উপরন্তু--- 'নবাবের ও উপকার করিতে পারিলে দুই এক খানা বড় বড় পরগনা পাইতে পারি'। সুযোগ বুঝে তার সদ্ব্যবহার শুধু

প্রতাপ এর ক্ষেত্রে নয় সকল কর্মচারী ক্ষেত্রে ছিল সত্য।সে যুগে প্রবল স্বাদেশিক চেতনা কারোর মধ্যে থাকবার কথা নয়, ছিলও না।

ইতিহাস এই উপন্যাসের পটভূমিকা মাত্র।ইতিহাস কে আশ্রয় করে দুটি পারিবারিক কাহিনী গ্রথিত হয়েছে।উপন্যাসের মূল ধারা প্রতাপ চন্দ্রশেখর শৈবলিনী কে নিয়ে তাদের জীবন হয়তো আশা নিরাশায় দোলায়িত হয়ে পারস্পারিক সংঘাতে ও মানসিক দ্বন্দ্বে পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সমাপ্তি লাভ করত। কিন্তু ইতিহাসের বেগবান প্রবাহ তাদের জীবনে অপ্রতিরোধ্য আলোড়ন সৃষ্টি করে তাদের ঐতিহাসিক রথযাত্রার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।অপর ধারায় নবাবের বেগম স্বামীর মঙ্গলকামনায় পরিচারিকা কুলসম কে নিয়ে তার ভ্রাতা ও নবাবের একান্ত বিশ্বাসভাজন সেনাপতি গুর্গণ খাঁ -এর গৃহে রাত্রিবেলায় উপনীত হন। বেগমের স্বামীর প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য দর্শন করে সন্ত্রস্ত গুর্গণ তার নবাবের দুর্গে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেন।দলনীও গৃহবধূ, তিনি ইতিহাসের প্রবাহে ভেসে গিয়েছেন।দুটি কাহিনী বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র ও দুর্বার তরঙ্গ প্রবাহের পরিণামমুখী হয়েছে।তথাপি একে অপরের পরিপূরক। দলনী যেদিন রাত্রিকালে ভ্রাতার সঙ্গে দেখা করবার কথা জানিয়ে গুর্গণ কে পত্র পাঠিয়ে ছিলেন সেই পত্র কে সূত্র করে বিধাতা দলনী শৈবলিনী এর অদৃষ্ট একত্র গাঁথলেন। পথে পরিত্যক্ত হবার পরে ক্রন্দনরতা দুর্ভাগিনী বেগমকে ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখর প্রতাপের গৃহপরিচারিকাসহ আশ্রয় দেন। সেই রাত্রে ইংরেজ কুঠিয়ালগণ প্রতাপের গৃহে বলপূর্বক প্রবেশ করে তাকে ও রামচরণকে ধরে নিয়ে যায়।বকাউল্লার পরামর্শে তারা দলনীকে ফস্টরের বিবি ভ্রমে অপহরণ করে। শৈবলিনী ও দলনী উভয়েই রাজনৈতিক আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয় উপন্যাসের পরিণাম অংশকে গভীর কারুণ্যে মন্ডিত করেছে। ঐতিহাসিক কাহিনীর সমাপ্তির সঙ্গে উপন্যাস অংশের দুটি কাহিনী শেষ হয়েছে নবাব সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে আমিয়ট,গলষ্টন,জনসন প্রাণ হারান। তারপরে নবাবের সৈন্য বাহিনী কাটোয়া গিরিয়া ও উদয় নালায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হল। ইতিহাসে বর্ণিত কাহিনীর সমাপ্তির সঙ্গে দলনী বেগম ও শৈবলিনী প্রতাপের কাহিনী ও শেষ হয়েছে।।দলনী তকি খাঁর চক্রান্তে নবাবের নির্দেশ অনুযায়ী বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। রামানন্দ স্বামীর কৃপায় শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহে আশ্রয়

পেয়েছে। তার নিষ্পাপতা প্রমাণিত হয়েছে।প্রতাপ শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর কে সুখী করার জন্য ও তার অপ্রতিরোধ্য প্রেমের তাগিদে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

উপন্যাসে ঐতিহাসিক রস সঞ্চার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই মন্তব্য করেছেন----

"ইতিহাসে সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে। ইতিহাসের সেই রস টুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ। তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই।কেহ যদি উপন্যাসে ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অকাট্য ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন,তবে তিনি ব্যঞ্জন এর মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সরষে সন্ধান করেন।মসলা আস্ত রাখিয়ে যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন।যিনি বাটিয়া ঘাটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই।কারণ স্বাদই এ স্থলের লক্ষ্য,মসলা উপলক্ষ মাত্র।এদিক থেকে 'চন্দ্রশেখর' আখ্যানে ইতিহাসের যথাযথ অনুকরণ এর মধ্য দিয়ে নয়, তার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণেও বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ ইতিহাস পরিবেশন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

১.৬ উপক্রমণিকা অংশের তাৎপর্য

'উপক্রমণিকা' শব্দের অর্থ প্রারম্ভ বা সূচনা।চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সূচনা হিসেবে 'উপক্রমণিকা' অংশটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।'উপক্রমণিকা' অংশটিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের অংশ হিসেবে দেখাতে চাননি।কিন্তু মূল উপন্যাসের সংকটটি এখানে রয়েছে।যার বিকাশ এবং পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে।সুতরাং 'উপক্রমণিকা' অংশটি সমগ্র উপন্যাসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। 'উপক্রমণিকা'-র বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 'উপক্রমণিকা' অংশের তিনটি পরিচ্ছেদ--

ক. বালক বালিকা,

খ.ডুবিলো বা কে উঠিল বা কে,

গ. বর মিলিল

প্রথম পরিচ্ছেদে বালক বালিকা যথাক্রমে প্রতাপ এবং শৈবলিনী।প্রতাপ তখন ষোলো বছরের কিশোর আর শৈবলিনী সাত আট বছরের। বালিকা তরুণ বয়সে প্রেম যে গভীরতা পায় এদের মধ্যে তখন তার শুরু হয়নি।কিন্তু ক্রীড়ারত এই বালক বালিকার আচরণে প্রকাশ পায় উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ।খেলার ছলে তাদের মধ্যে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়।দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রথম বাক্যে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য--- ‘এইরূপে ভালোবাসা জন্মিল’।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক মন্তব্য করেছেন--- ‘বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে’।এই মন্তব্যটি ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী।কারণ সমগ্র উপন্যাসে প্রতাপ ও শৈবলিনীর ভালোবাসা উভয়ের জীবনে অভিসম্পাত রূপে দেখা দেয়। প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনে ট্রাজেডি ঘনিয়ে আসার কারণ বাল্য প্রণয়।প্রতাপকে এর মূল্য দিতে হয়েছিল নিজের জীবন দিয়ে আর শৈবলিনী যদিও প্রায়শ্চিত্তের পর স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিল কিন্তু সেই প্রত্যাবর্তন এর মধ্যে কোন ভবিষ্যৎ শর্ত ছিল না। পৃথিবীতে শৈবলিনী বেঁচে থাকা এক প্রকার মৃত্যুই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আরেকটি ঘটনার তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতাপ শৈবলিনী র প্রণয় যে কোনদিনই পরিণতিতে পৌছবে না একথা প্রতাপ জানতো।কিন্তু শৈবলিনী ধারণা ছিল তাদের বিবাহ হবে। শৈবলিনী বয়সে কাঁচা এবং তার অভিজ্ঞতা একেবারে কম থাকার ফলে তার পক্ষে স্বাভাবিক বিধি-নিষেধ সম্পর্কে ধারণা না থাকা অসম্ভব নয়।কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শৈবলিনী বুঝলো – ‘এই জন্মে প্রতাপ কে পাইবার সম্ভাবনা নাই’। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলো যে ‘প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই’।প্রেম আসলে সমাজ বিধি-নিষেধ শোনে না।প্রেম শোনে শুধু হৃদয়ের কথা। শৈবলিনীও সমাজের বাধা কে অগ্রাহ্য করে প্রতাপ কে পেয়ে সুখী হতে চেয়েছে।প্রতাপ কে পাওয়া অসম্ভব জেনেও শৈবলিনীর দুরন্ত প্রেম নিজের বিবাহিত জীবনকে অস্বীকার করে নিজের ভালোবাসা কে প্রতিষ্টিত করতে চেয়েছে।সমগ্র উপন্যাস জুড়ে শৈবলিনী হৃদয়ের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ও তার পরাজয় চিত্রিত হয়েছে।যার অনিবার্য সম্ভাবনার চিত্রও ঔপন্যাসিক উপক্রমণিকা অংশে পেয়েছেন।এদিক থেকে উপক্রমণিকা অংশের সঙ্গে মূল কাহিনী সংযোগ সূত্রটি রচিত

হয়েছে।'উপক্রমণিকা'-র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতাপ ও শৈবলিনীর চরিত্রের মূল প্রবণতার একটা আভাস পাওয়া যায়।শৈবলিনী কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত।অন্যদিকে প্রতাপ স্থির চিত্তের অধিকারী। উভয় যখন বুঝেছে এই জীবনে তাদের মিলনের সম্ভাবনা নেই তখন উভয় স্থির করেছেন গঙ্গায় ডুবে আত্মহুতি দেওয়ার। কিন্তু দেখা গেছে প্রতাপ ডুবেছে। শৈবলিনী ডুবল না অর্থাৎ প্রতাপ তার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে, কিন্তু শৈবলিনী দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। সম্ভবত অল্প বয়সের কারণে মৃত্যুভীতি তাকে গ্রাস করেছে ।এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গে লেখক সম্ভবত শৈবলিনী চরিত্রে দুর্বল চিত্ততার প্রতি এবং অন্যদিকে আরো একটি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন সেটি হল আত্ম স্বার্থের দিক। যা ব্যক্ত হয়েছে শৈবলিনীর স্বগোতক্তিতে---'মনে ভাবিল কেন মরিবো'! ব্যক্তিগত স্বার্থের এই বীজ লেখক শৈবলিনী চিত্তে রোপন করে প্রায়শ্চিত্তের পর শৈবলিনী স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার পথ তৈরি করে রেখেছেন।

দ্বিতীয় বার গঙ্গায় সন্তরণ কালে প্রতাপের জলে ডুবে মৃত্যু বরণ করার আহ্বানকে শৈবলিনী ডুবে না মৃত্যু গ্রহণের কারণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?' এরপর প্রতাপ এর অনুরোধে শৈবলিনী প্রতাপ কে ভুলে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে। শৈবলিনী অবশ্য বলেছে---'আজ হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি।আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব।আজই হইতে শৈবলিনী মরিল'।আসলে শৈবলিনী চরিত্র চিত্রায়নে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম থেকেই দ্বিধান্বিত ছিলেন। সেটা দ্বিধা হল সমাজ সত্ত্বার সঙ্গে শিল্পী সত্তার দ্বন্দ্ব ।শৈবলিনীর দুর্বার প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অস্বীকার করতে পারেননি, তেমনি দাম্পত্য প্রেমের জয় ঘোষণা করার জন্য শৈবলিনী কে চন্দ্রশেখর এর কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিপ্রায়টি আর অস্পষ্ট থাকে না।সমগ্র উপন্যাস এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন দেখা যায়। যার বীজ রচিত হয়েছিল উপক্রমণিকা অংশে। না হলে সেই বালিকার পক্ষে কি বলা সম্ভব ছিল --- 'কেন মরিবো? প্রতাপ আমার কে?' আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্র শৈবলিনী প্রতি সুবিচার করেননি।মনে হয় পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর পাপের বীজ পুঁতেছেন তার স্বভাবের মধ্যে। শৈবলিনী প্রতি সুবিচার ও অবিচারের এই

টানাপোড়েন সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বারবার প্রকাশিত হয়েছে আর তাতেই উপন্যাসের অংশ বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

"উপক্রমণিকা"-র তৃতীয় পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখরের অনুপ্রবেশ।ডুবন্ত প্রতাপ কে চন্দ্রশেখর উদ্ধার করেছেন। তারপর প্রতাপ কে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে প্রতাপের মায়ের অনুরোধে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করলেও শৈবলিনী প্রতাপ এর সম্পর্ক চন্দ্রশেখর এর কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়।লেখক জানিয়েছেন ---"চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না"।চন্দ্রশেখর পন্ডিত ব্যক্তি অধ্যয়ন তাঁর জীবনের ব্রত জ্ঞান। সেই কারণে জীবনের বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে বত্রিশ বছর পর্যন্ত বিবাহ করেননি। আর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিবাহ করলেও কোন সুন্দরী রমনীকে বিবাহ করবেন না। কারণ তাঁর ধারণা ছিল --- ‘সুন্দরীর দ্বারা মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা।সংসার বদ্ধ হওয়া হইবে না’।কিন্তু শৈবলিনী কে দেখে চন্দ্রশেখরের ব্রত ভঙ্গ হল।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনী কে বিবাহ করলেন আর আট বছর পর যখন আখ্যান শুরু হল তখন চন্দ্রশেখরের বিবাহিত জীবনে কোন পরিবর্তন হয়নি। শৈবলিনী উপেক্ষিতাই রয়ে গেছে। কিন্তু এক জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রে শৈবলিনীর নির্ধারিত অবস্থানে তার আনন্দ ও শান্তিপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখে চন্দ্রশেখর মনে প্রবল অনুশোচনার সঞ্চার হল। শৈবলিনীকে বিবাহ করার জন্য তিনি অনুতাপ অনুভব করলেন।স্বাভাবিক আবেগের অভাবের কারণে শৈবলিনীর হৃদয় তাঁর জন্য প্রেম সঞ্চার হওয়া সম্ভব নয় এটা অনুভব করলেন।তিনি যদিও এর মধ্যে শৈবলিনীকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন। এমন অনুভূতিও তাঁর হয়েছে। শৈবলিনী লরেন্স ফস্টর কর্তৃক অপহৃত হওয়ার পর প্রিয় গ্রন্থারাজি আগুনে নিক্ষেপ করা তার পরিচয় প্রদান করে।চন্দ্রশেখরের চরিত্রে এই ধরনের পরিবর্তন যে ঘটতে পারে তার আভাস বঙ্কিমচন্দ্র ‘উপক্রমণিকা' অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দিয়েছেন---‘শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল।সৌন্দর্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়’!

সুতরাং উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র প্রতাপ,শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরের পূর্ব ইতিহাস ও চরিত্রের মূল প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্র উপক্রমণিকা অংশ উপস্থিত করে উপন্যাসের সঙ্গে তার

সম্পর্ক স্থাপন করেছেন যুক্তিপূর্ণভাবে। উপক্রমণিকার সঙ্গে যোগাযোগ কোন ভাবেই নয় শিথিল বদ্ধ নয় এবং পাঠকের কাছেও তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। কাজেই উপন্যাসের সামগ্রিক বিচারে উপক্রমণিকা অংশের গুরুত্ব বা তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

১.৭ ভাষারীতি

বাংলা ভাষা প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে রচনা ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা বিষয় অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া কর্তব্য। রচনায় প্রধান গুণ ও প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। অর্থগৌরব থাকলে তা সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। যে ভাষায় অস্পষ্ট ও সুন্দর হয় সেই ভাষা ব্যবহার করা বিধেয়।যদি টেকচাঁদী বা হুতোমি ভাষায় কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তা করা বাঞ্ছনীয়। আবার ভাবের স্পষ্টতা ও সৌন্দর্যের জন্য বিদ্যাসাগর বা ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করতে হয় তবে তা গ্রহণ করা বিধেয়। 'যদি তাহাতেও কার্যসিদ্ধি না হয় আরো উপরে উঠিবে'। লিখেছেন যে ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার জন্য ইংরেজি ফারসি সংস্কৃত গ্রাম্য বন্য যে ভাষার প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই রচনাকে সৌন্দর্য বিশিষ্ট করে তুলতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র যে নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রবন্ধে তিনি অনুসরণ করেছেন চন্দ্রশেখর এ তিনি ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন শিল্পী ছিলেন গুরুগম্ভীর বর্ণনার জন্য তিনি গ্রহণ করেছেন ভাষার ঐশ্বর্যমণ্ডিত অভিজাত অরূপ আবার লঘু বিষয়ের জন্য প্রচলিত কথ্য রীতি শৈবলিনী নরক দর্শন ও গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনী প্রতাপের সন্তরণ দৃশ্য এক জাতীয় ভাষায় বর্ণিত হয়নি

"*রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিরময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই-তৎপরিবর্তে লৌহসূচী সকল অগ্রভাগ ঊর্ধ্ব করিয়া রহিয়াছে।শৈবলিনীকে মহাকায় মহাপুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন।পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই,সেতু নাই।*

প্রতাপ, শুন,তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি-তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়।শুন,আমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব।আজি হইতে আবার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব।আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

মন্তব্য

দুইটি উদ্ধৃতি পাঠ করলে বোঝা যায় যে,প্রথমটিতে সংস্কৃত অনুসারী ভাষা ও দ্বিতীয়টিতে কথ্য ভাষার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।আবার সহজবোধ্য নমনীয় কথ্য ভাষার পরিচয় আমরা সুন্দরী সঙ্গে শৈবলিনী কথোপকথনে পাই---

সুন্দরী কিঞ্চিৎ পুরুষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল

"সত্য কথা বলি বলিবি"?

শৈবলিনী-বলিব।

সুন্দরী- এই গঙ্গার উপর?

শৈবলিনী-বলিব। তোমার জিজ্ঞাস আর প্রয়োজন নাই, অমনি বলিতেছি। সাহেবের সঙ্গে আমার এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই।আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্মের প্রতি তো হইবেন না।

সুন্দরী-তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করিবেন তাহাদের সন্দেহ করিও না।তিনি ধর্মাত্মা।অধর্ম করিবেন না।তবে আর মিছে কথা সময় নষ্ট করিও না।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল।একটু কাঁদিল।চোখের জল মুছিয়া বলিল, 'আমি যাইব। আমার স্বামী আমায় গ্রহণ করিবেন।কিন্তু আমার কলঙ্ক কি তখন ঘুচিবে'? এখানে কথোপকথনের ভাষার ছন্দ সাবলীল ও গতি চঞ্চল।উপরন্তু নারী ও পুরুষের কথোপকথনের ভাষার সুর ও ছন্দ পৃথক।

দলনী বলিল-'প্রাণেশ্বর!আপনি যাহা বলিলেন তাতে আমি কি বলিব? কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে।আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না'।

মীরকাসিম-'এ বিষয়ে কি বাঙালার নবাবের কর্তব্য যে স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে? না বালিকার কর্তব্য যে এই বিষয়ে পরামর্শ দেয়'?

দলনী অপ্রতিহত হইল।ক্ষুন্ন হইল।বলিল-'আমি না বুঝেই বলিয়াছি অপরাধ মার্জনা করুন স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলিয়াই এসকল কথা বলিয়াছি'।

বর্ণনা যে কত কবিতা পূর্ণ হতে পারে তার পরিচয় আমরা চন্দ্রশেখর কর্তৃক দৃষ্ট নিদ্রিতা শৈবলিনী রূপ বর্ণনা মধ্যে পাই।

"চন্দ্রশেখর প্রফুল্ল চিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে!- তিনি দাঁড়াইয়া,দাঁড়াইয়া,দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে, শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমন্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃখন্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রুযুগলতলে, মুদ্রিত পদ্মকরোক সদৃশ, লোচন-পদ্ম দু'টি মুদিয়া রহিয়াছে;- সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন,ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত রহিয়াছে---যেন কুসুমরাশির উপর কে কুসুম রাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে"।

প্রতাপ এর দৃষ্টিতে শৈবলিনী এর রূপ বর্ণনা নিম্নরূপ—*"প্রতাপ দেখিলেন যে শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে।যেন বর্ষাকালে স্থির শ্বেত-বারি বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত পদ্ম রাশি ভাসাইয়া দিয়েছে মনমোহিনী স্থির শোভা!দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না"।*

দলনীর রূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন----

"তখন যুবতী পুস্তক ত্যাগ করিয়া,গাত্রোত্থান করিল। নির্দ্দোষগঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গরাশি-তুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার দুলিল---স্বর্ণরচিত সুগন্ধ-বিকর্ণকারী উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল---তাহার অঙ্গ সঞ্চালন মাত্র গৃহ মধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল।অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্য মাত্র তরঙ্গ উঠে,তেমনি তরঙ্গ উঠিল"।

উন্মত্ত অবস্থায় আমরা শৈবলিনী মুখে ছড়া ও গীত শুনি। ছড়া হল---

'স্বামী আমার সোণার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে

তেকাটাতে এলে সখা বুঝি পথ ভুলে'?

গীত হল---

'কি করিলে প্রানসখী, মনচোরে ধরিয়ে,

ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে'।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সে অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয় দিয়ে বলেছে যে মনচোর চন্দ্রশেখর,ধরল চন্দ্রশেখরকে,ভাসিল চন্দ্রশেখর,দু'কূল কি তা জানিনে। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল 'তুমি চন্দ্রশেখরকে চেনো'?

চন্দ্রশেখর বললেন, 'আমিই চন্দ্রশেখর'।

১.৮ বর্ণনারীতি

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা রীতির মধ্যে তার প্রকৃতি চেতনা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং মাধুর্য আস্বাদন করেছেন কিন্তু প্রকৃত জীবনের সঙ্গে মানব মনের যে নিগূঢ় সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন তা তিনি করেননি তার কারণ হয়তো এই যে প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আছে এবং সেই প্রকৃত যে মানবজীবনের সুখে দুঃখে আন্দোলিত হয়ে ওঠে, যে প্রকৃতির মধ্যে শোনা যায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায়— "The still sad music of humanity", তার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র দেননি। মনে হয় যে তিনি প্রকৃতিকে নিছক জড়শক্তি রুপে গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন ----

'তুমি জড় প্রকৃতি। তোমায় কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই,মমতা নাই,স্নেহ নাই---জীবের প্রাণনাশে সংকোচ নাই,তুমি অশেষ অক্লেশর জননী-অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি।তুমি সর্ব্বসুখের আকর,সর্ব্বমঙ্গলময়ী,সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী,

সর্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী নানারূপরঙ্গিনি!

গতকাল যে প্রকৃতিকে ললাটে চাঁদের টিপ পড়ে মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধারণ করে ভুবন মোহন হাসিতে পৃথিবীতে মুগ্ধ করতে দেখা গিয়েছে, আজ আবার তার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ।সে আজ জীবের প্রাণনাশিনী অশেষ ক্লেশের উৎসরুপা এবং মহাভয়ঙ্করী।তোমার বুদ্ধি নাই,জ্ঞান নাই, চেতনা নাই---কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী,সর্ব্বকর্ত্রী,সর্বনাশিনী এবং সর্ব শক্তিময়। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম'।

আবার বঙ্কিমচন্দ্র ‘চন্দ্রশেখর’-এর তৃতীয় খন্ডের ষষ্ঠ পরিছেদে শৈবলিনী ও প্রতাপের সন্তরণ দৃশ্যে বর্ণনা করেছেন যে জড় প্রকৃতির সৌন্দর্য অমলিন, জড় নীলিমার মাধুর্য বিকৃত হয় না---ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচির মালা ছেঁড়ে না। তারা তেমনি জ্বলে, তীরে বৃক্ষ তেমনি দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনি খেলে। একে জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য বলা যায় না। স্নেহময়ী মার মতো সকল সময়ই আদর করতে চায়।

অবশ্য প্রকৃতির এই রূপ ধরা পড়েছে প্রতাপ এর চোখে ।শৈবলিনীর চোখে নয়। কারণ প্রতাপের ছিল সংবেদনশীল মন ও অন্তরে সৌন্দর্যবোধ।

‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে গঙ্গা বর্ণনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।প্রভাতকালীন শান্ত নদীর কুলুকুলু ধ্বনি মধুর মধুর গান করে,রোদ উঠলে দেখা যায় বিচিরাশির উপর রোদ জ্বলছে, রাজহংস তাদের উপর নেচে চলেছে, কখনো আবার বায়ুর গর্জন ও হুঙ্কার তরঙ্গ হঠাৎ ফুলে ওঠে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, প্রতিকূল বায়ু রোধ করে দাঁড়ায় ,অন্ধকার নদীতে তারার ছায়া প্রতিফলিত হয়।আবার জ্যোৎস্না রাতে গঙ্গার শোভা হয়ে ওঠে অনির্বচনীয়। সেই অবিস্মরণীয় সন্তরণ দৃশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার গুণে গঙ্গা হয়ে উঠেছে সুখের সাগর। গঙ্গার তরঙ্গ সমূহ মেঘের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১."চন্দ্রশেখর" উপন্যাস কত সালে কে রচনা করেন?

উত্তর--চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি ১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন।

প্রশ্ন ২. "চন্দ্রশেখর"উপন্যাসে উপক্রমণিকা অংশের কটি পরিচ্ছেদ এবং কি কি??

উত্তর--"চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে উপক্রমণিকা অংশের তিনটি পরিচ্ছেদ।

ক. বালক বালিকা

খ. ডুবিল বা কে উঠিল বা কে

গ. বর মিলিল

প্রশ্ন ৪. "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের মূল পর্বের প্রথম খণ্ডটি সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর--উপন্যাসের প্রথম খন্ডের নাম “পাপীয়সী”। চন্দ্রশেখর ন্যায় রূপবান তত্ত্বজ্ঞ এবং সহযোগী পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হলেও এবং আট বছর বিবাহিত জীবন যাপন করলেও শৈবলিনী বাল্য প্রনয়ের অনুরাগ ভুলতে পারেনি।তবে এই খন্ডের নামটি বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক দৃষ্টিকে ব্যক্ত করেছে এর ফলে তাঁর শিল্পীসুলভ নির্লিপ্ততা ব্যক্ত হয়নি।

প্রশ্ন ৫. চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বর্ণিত একটি রূপকের বর্ণনা দাও।

উত্তর--বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে রূপকের ব্যবহার করেছেন।বজরায় শৈবলিনী স্বপ্ন দেখেছিল যে সে যেন একটি পদ্ম। সরোবরে প্রান্তে এক সুবর্ণ নির্মিত রাজহংস খেলা করে বেড়াচ্ছে। যখন রাজহংস কে সে ধরতে চেয়েছে ,তখন সে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে নদী তীরে একটি শূকর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মুখ ফষ্টরের মতো।শূকর তাকে প্রলুব্ধ করেছে ও হাঁস ধরে দেবার কথা বলেছে।

১.৯ চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি কোন শ্রেণীর উপন্যাস তা যথার্থ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২. চন্দ্রশেখর উপন্যাসের উপক্রমণিকার গুরুত্ব কি?

৩. চন্দ্রশেখর উপন্যাসের বর্ণনা রীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪. চন্দ্রশেখর উপন্যাসের ভাষারীতির ধরন আলোচনা করো।

১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১.বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা - ভূদেব চৌধুরী।

২.বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত -অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. "চন্দ্রশেখর" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলোচনা - মিলন রায়।

৪. উনিশ শতক - অলোক রায়।

৫. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. সুকুমার সেন।

৭. 'চন্দ্রশেখর' আলোচনা - বিদিশা সিনহা।

একক ২ "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ

বিন্যাসক্রম

মুখ্য চরিত্র

২.১ শৈবলিনী

২.২ প্রতাপ

২.৩ চন্দ্রশেখর

২.৪ দলনী বেগম

২.৫ মীরকাসেম

গৌণ চরিত্র

২.৬ রমানন্দ স্বামী

২.৭ গুর্গণ খাঁ

২.৮ কুলসম

২.৯ লরেন্স ফস্টর

২.১০ তকি খাঁ

২.১১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

২.১২ গ্রন্থপঞ্জী

মুখ্য চরিত্র

২.১ শৈবলিনী

বঙ্কিমচন্দ্র ‘বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে লিখেছেন--- ‘কেহই এমন মানুষ নাই যে তাহার চিত্ত রাগ, দ্বেষ, কাম,ক্রোধাধি অস্পৃশ্য, জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঘটনাধীনে সেই সকল রিপু কর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ প্রভেদ এই যে কেহ আপন উচ্চালিত মনোবৃত্ত সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন । সেই ব্যক্তি মহাত্মা কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না কাহারই জন্য বৃক্ষের বীজ মুক্ত হয় চিত্ত সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর।তাহাতেই এই বৃক্ষের বৃদ্ধি’।

এ শুধু ‘বিষবৃক্ষ’-এর নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাসের মূল কথাই এই যে মনুষ্য মাত্রই ইন্দ্রিয়ের অধীন। ইন্দ্রিয় সঞ্জাত প্রণয় এবং পাপ পুণ্যবোধ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা জগতকে নানাভাবে আলোড়িত করে। ‘চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীকে পাপাত্মা ও প্রতাপ কে পুণ্যাত্মা রূপে দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে ত্যাগ করে প্রতাপের মোহে পতঙ্গের মত তার প্রতি ধাবিত হয়েছে। নতুবা লরেন্স ফস্টরের সাধ্য ছিল না শৈবলিনীকে অপহরণ করে। শৈবলিনী প্রতাপ কে স্পষ্ট বলেছে---‘আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হতে?-তোমা হতে! কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য।... কাহার জন্য আমি গৃহ ধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য’।

শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের ছিল অন্তরের গভীর তম অনুচ্চারিত অব্যক্ত ভালোবাসা। প্রতাপ শৈবলিনী কে বলেছে 'পাপিষ্ঠা’।কারণ শৈবলিনী যে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে স্থির থাকতে পারেনি।এটা কখনোই প্রতাপের কাম্য ছিল না। প্রতাপ শৈবলিনী কে জানিয়েছে---‘ ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন,ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া ভয় তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয় আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া ছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ- তোমার প্রবৃত্তির দোষ!তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?

ক্রুদ্ধ শৈবলিনী প্রত্যুত্তরে বলে---তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার ওই অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম,আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন?না পাইলাম ত মরিলাম না কেন ? তুমি কি জান না, তোমার এই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল'?

শৈবলিনী প্রতাপের মোহে মুগ্ধ। কাহিনীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে প্রতাপের চিত্তের গভীরেও শৈবলিনী অনেকখানি স্থান অধিকার করেছিল। শৈবলিনী বিবাহিত। তার স্বামী চন্দ্রশেখর। অন্যদিকে প্রতাপও বিবাহিত,তার স্ত্রী রূপসী। তবুও তৃতীয় খন্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'অগাধ জলে সাঁতার' অধ্যায়ে প্রতাপ নিজের ঘরের কথা ভুলে গিয়ে, স্ত্রীর কথা বিস্মৃত হয়ে শৈবলিনীর হাত ধরে জলে ডুব দিতে চেয়েছিল। আত্মবিসর্জনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল প্রতাপ।

শৈবলিনী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের যোগসুত্র শৈবলিনীকে আশ্রয় করে। উপন্যাসে নৈতিকতার উত্তাল সমস্যা তাকে নিয়েই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচকদের নানা অভিযোগ। শৈবলিনীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত দ্বিধা এবং দ্বিধাভেদে অন্তরের গভীর রহস্য খুঁজেছেন। শৈবলিনী শুধু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রই নয়,সেইসঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ তার জীবন। প্রতাপের সাহচর্যে বাল্য ও কৈশোরের প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায়ে শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের বিবাহিতা পত্নী। শৈবলিনী যে জীবনের প্রতি মুহূর্তে সমস্যাসংকুল জটিলতার মধ্যে পর্যবসিত হবে বা আবর্তিত হবে তা উপক্রমণিকা অংশে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়ে দিয়েছিলেন----'বাল্য প্রণয় অভিসম্পাত আছে'। ফস্টরকে উপলক্ষ করে প্রতাপ এর উদ্দেশ্যে করে গৃহত্যাগে তার জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে সূত্রপাত আর প্রতাপ কে স্পর্শ করে গঙ্গাবক্ষে প্রাণান্তকর শপথে এর পরিসমাপ্তি। চতুর্থ পর্যায়ে শৈবলিনীর কঠিন প্রায়শ্চিত্তের সূচনা এবং তার জীবন কাব্যের শেষ পর্যায়ে শৈবলিনীর মনের পাপ স্বামীর কাছে প্রকাশ, সংকল্প এবং এই বিষয়ে প্রতাপের অনুমতি প্রার্থনা।

উপন্যাসের সূচনায় শৈবলিনী চরিত্রের কমনীয়তা লক্ষণীয়। উপক্রমণিকা অংশে সপ্রতিভ ও চঞ্চল,কৌতুক দিক থেকে উজ্বল শৈবলিনীর প্রথম আবির্ভাব পাঠক কে মুগ্ধ করে। বালিকা,ক্ষুদ্র করপল্লবে, তদ্বৎসুকুমার বন্য কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া বালকের গলায় পরাইল।আবার খুলিয়া লইয়া আপন করবীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল।" প্রাণোচ্ছল এই শৈবলিনী এর অপরূপ বর্ণনা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী চরিত্রের সরলতার দিকটি দেখিয়েছেন।কাজেই প্রতাপ অথবা বঙ্কিমচন্দ্র যতই পাপিষ্ঠ বলে চিহ্নিত করুন না কেন প্রকৃত পক্ষে শৈবলিনী মনোজগতে কখনো কোন পাপ বাসা বাঁধেনি। চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বিবাহের পর শৈবলিনী আট বছরের বিবাহিত জীবনের কোনো বর্ণনা দেন নি বঙ্কিমচন্দ্র।

চন্দ্রশেখরের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে শৈবলিনী স্বামীগৃহে আসেনি। বরং শৈবলিনীর মনে হয়েছে সে এবং প্রতাপ একই বৃন্তের দুটি ফুল। চন্দ্রশেখর বৃন্ত সংলগ্ন ফুল দুটিকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। শৈবলিনী অগাধ প্রেম পিপাসা অতৃপ্তই থেকে গেছে।কঠিন মানসিক সংগ্রামে বিপুল শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত শৈবলিনী ক্রমশ উন্মাদগ্রস্ত হল।তবে শৈবলিনীর নরক ভোগ বঙ্কিমচন্দ্রের নীতি বাদে অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল এই বিষয়টিকে শৈবলিনীর জন্য যেন অপরিহার্য করে তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। শৈবলিনী নরক দর্শনের পর বিকৃত দৃষ্টিতে দেখেছে লরেন্স ফস্টর ও পার্বতী কে। চন্দ্রশেখর কে সে মনে করেছে ফস্টর এবং সুন্দরীকে পার্বতী।অবশেষে মনোসন্ধিক্ষণ মূলক চিকিৎসা ও শৈবলিনীর রোগমুক্তি। সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত নারীর এই ব্যাধি মুক্তি রূপের কোথাও আনন্দের কোন স্পর্শ ছিল না। তবু নরকভোগের সব লাঞ্ছনা অতিক্রম করে যাবতীয় যোগবল ও চিকিৎসা ব্যর্থ করে তার ক্ষীণ দুর্বল প্রাণ আত্মপ্রকাশ করল। এরপরেও প্রতাপের প্রতি তার উক্তি -‘স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার।কতদিন থাকবে জানিনা। এ জন্মে তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করিও না’।কাজেই শৈবলিনীর হৃদয়ের আগুন নেভেনি। সে আগুন লেলিহান শিখা নিয়ে যেকোনো সময় জ্বলে উঠতে পারে।শৈবলিনীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি---‘তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই’।এই 'তুমি' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বোধহয় শুধু প্রতাপকে বোঝাননি, তুমি হল শৈবলিনীর প্রেম,তার অস্তিত্ব আর আমিত্ব। প্রতাপহীন শৈবলিনীর

জীবন অর্থহীন, অস্তিত্বহীন,নীরব যন্ত্রণার নিয়তি।এই নিয়তির ভূমিকার কথা বঙ্কিমচন্দ্র আগেই জানিয়েছেন।শৈবলিনী 'মনে মনে জানি ত প্রতাপের সাথে আমার বিবাহ হইবে।প্রতাপ জানি ত বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী এই প্রথম হিসাবে ভুল'।আসলে সজ্ঞান আলোর নিচে লুকিয়ে থাকে অচেতন যে মন তাকে আমরা বলি অবচেতন মন।সচেতন মনের প্রবল প্রভাব অচেতন মনের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন ছিল।সচেতন মনের দিকে আমাদের সংস্কার অনুযায়ী সুস্থ দাম্পত্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ।তাই শৈবলিনীর বিবর্তন আমাদের মনের মত হল না।

ভীমা পুষ্করিণীতে স্নানরতা শৈবলিনীর নারীর জীবনের শূন্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা,এমন প্রশ্নের উত্তরে মনে হয় ভীমা পুষ্করিণীতে নারীর মন বদ্ধ জীবনের গণ্ডি থেকে বিহংগ রানীর মত ক্ষনিকের মুক্তিতে উল্লাসিত হয়েছে। এখানে শৈবলিনীর হৃদয়ের স্বাধীন প্রেম,স্বাধীন নীতি ধর্মের কাছে নয়, সাংসারিক কর্তব্যের কাছে নয়,স্বামীর প্রেমের কাছেও নয়, তার আনুগত্য শুধু নিজের হৃদয়ের কাছে। নৈতিকতার কারণে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত দৃশ্যের অবতারণা করলেও তাকে আধুনিক জীবনবোধের উপাদানেই গড়েছেন। প্রতাপকে পাওয়ার জন্যে ফস্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগ অনেকেই সমর্থন করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন- 'ফস্টরের সহিত কুল ত্যাগ করিয়া গেলে প্রণয় লাভ যে কি প্রকারে সুলভ হইবে দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়। পুরোন্দপুরের কুটিরে জাল পাতিয়া প্রতাপ পক্ষীকে ধরবার বিশেষ কি সুবিধা ছিল জানিনা, কিন্তু এখানে শৈবলিনী প্রতাপের চরিত্র সম্বন্ধে যে প্রকাণ্ড একটা হিসাব ভুল করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত'।শৈবলিনীর চরিত্র বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে প্রতাপের প্রতি প্রণয় অনুভবেও রোমান্টিকতাই প্রকাশিত। সুখের নীড়ে সামান্য তৃপ্তির অভিলাসিনী সে নয়। বাধা মুক্ত আকাশে স্বপ্নশুভ্রনীলিমার জন্য তার আর্তি।এতে যদি তার জীবনে বজ্রাঘাত নেমে আসে,এতে যদি তার ব্যথা দীর্ণ সত্তা সহস্র ভাঙ্গনের মুখোমুখি হয়, তবুও সে প্রেমিকের চরণে নিজেকে নিঃশেষ সমর্পন করবে। শৈবলিনীর প্রতাপ লাভে এই অসম্ভব আশার মধ্যে একটা কারুণ্যের দিকও আছে।কিন্তু তারপর,সব শেষ—'দীর্ঘকাল সঞ্চিত সুখস্বপ্ন এক মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া

গেল।নিদারুণ বজ্রাঘাতে আশার প্রণয় যৌথ ধুলিস্যাৎ হইয়া গেল।শৈবলিনী মনের রাজ্যে একটাও যুগান্তর সংঘটিত হইয়া গেল। তাহার বড় স্থান হইতে প্রতাপের প্রতি অনুরাগ এর মূল পর্যন্ত উৎপাটিত হইল এবং শৈবলিনী প্রকৃতপক্ষে নবজীবন লাভ করিল'।

প্রতাপ তাকে গ্রহণ করবে না এই নিয়ে শৈবলিনী মনে কোন দিন কোন রকম প্রশ্ন জাগে নি। সমাজ শক্তি যে প্রতাপের মুর্তি ধরেও দেখা দিতে পারে, এই চিন্তা তার কল্পনার অতীত ছিল।অপ্রত্যাশিত আঘাত নিগূঢ়তায় যে অতীতের দিকে তাকিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের কথা চিন্তা করেছে যে,সে এক সংগ্রাম ক্লান্ত যোদ্ধা। তার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়।প্রতাপের সম্বন্ধে সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়েও সে একেবারে ভেঙে পড়েনি। নতুন আশায় বুক বেঁধেছে।গঙ্গাবক্ষে একই সঙ্গে তার মধ্যে মিলেছে পরম পুরস্কার ও চরম শান্তি।

শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের যে চিত্র উপন্যাসে দেখানো হয়েছে তা দেখানো হয়েছে তা মনস্তত্ত্ব সম্পন্ন হলেও এত বড় একটা যুগান্তকারী বৈপ্লবিক অনুভূতির জন্য শৈবলিনী চিত্ত প্রস্তুত ছিল কিনা তা সন্দেহের বিষয়। প্রতাপ শৈবলিনীকে সুখী হওয়ার আশীর্বাদ দিলে সে প্রতাপ কে বলেছে-'তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।এ জন্মে তুমি আমার সাথে দেখা করিও না'।প্রতাপের মৃত্যুর অর্থ শৈবলিনী শান্ত দাম্পত্য জীবন কাটানোর নীরব যন্ত্রণারই প্রতীক।তাই শৈবলিনীর নিয়তি তার নব জন্মান্তর কি সম্ভব করেছে! শৈবলিনীর এই পরিবর্তনের বীজ তার চরিত্রের মধ্যে ছিল এটা বিশ্বাস করা কঠিন।এ যেন অনেকটা আরোপিত বলে মনে হয়।

২.২ প্রতাপ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের পরে প্রতাপ চরিত্র বিশেষ স্মরণীয়। প্রতাপ কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, কিন্তু প্রতাপ এবং শৈবলিনীকে কেন্দ্র করে গল্প আলোড়িত হয়েছে।প্রতাপ অসাধারণ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সক্রিয় চরিত্র। কর্মের উদ্দীপনা প্রেমের গভীরতা ও আদর্শবাদ উপন্যাসে তাকে বিশেষ উল্লেখ্য করে তুলেছে। উপন্যাসের যে

দুটি মানবজীবনাশ্রয়ী আখ্যায়িকা আছে তার প্রধান ধারায় প্রতাপ অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তার ভূমিকাও বৃহৎ। সে নির্ভীক,দৃঢ়চেতা।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে, নায়ক হবেন সৎ যথাযোগ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে দৃঢ় আসক্ত। সৎ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে নায়কের মধ্যে থাকবে জীবনের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও তার নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা।তার জীবনের বিপর্যয় তাই দর্শক মনে ভীতি ও করুণার উদ্রেক করে তোলে। প্রতাপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমূহ তাকে নায়কোচিত গুণরাশিতে মন্ডিত করেছে।

উপন্যাসের মূল পর্ব শুরু হওয়ার পূর্বেই উপক্রমণিকা অংশ আমরা প্রতাপ কে দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন -'ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতে ছিল।... বালকের নাম প্রতাপ...প্রতাপ প্রাপ্তবয়স্ক'।

এই অংশেই মনে হয় প্রতাপই এই উপন্যাসের নায়ক।একই সঙ্গে ওই পর্বেই পরিচয় পাওয়া যায় নায়িকা শৈবলিনীরও।পরবর্তী পরিচ্ছেদে লেখক নিজেই জানান "এইরূপে ভালোবাসা জন্মিল।ষোলো বছরের নায়ক - আট বছরের নায়িকা।" অর্থাৎ লেখকই তাঁর উপন্যাসের নায়ক নায়িকার পরিচয় দিয়েছেন।'বালকের ন্যায় কেহ ভালোবাসিতে জানেনা।" তবে "বাল্যকালের ভালোবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাৎ আছে'। এই একটিমাত্র কথাটিই মূল উপন্যাসের আভাস দিয়ে দেয়।এই 'অভিসম্পাৎ'-এর জের উপন্যাসের শেষাবধি বয়ে বেড়াতে হয়েছে প্রতাপ-শৈবলিনীকে-বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকাকে।উপন্যাসের মূল পর্ব শুরু হয় চন্দ্রশেখর শৈবলিনী বিবাহের আট বছর পর থেকে। অর্থাৎ উপন্যাসের প্রথম চমক উপক্রমণিকা অংশে লেখক দিয়ে দেন। প্রতাপ-শৈবলিনীর বিবাহ হয় না। তাদের মিলন হয় না।শৈবলিনী বুঝেছিল -'এ জন্মে প্রতাপ কে পাইবার সম্ভাবনা নাই'। তাই জন্য তারা গোপনে পরামর্শ করল তারা একসাথে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দেবে। কিন্তু দেখা গেল প্রতাপ ডুবল। শৈবলিনী ডুবল না।সেই সময়ে শৈবলিনীর মনে ভয় হলো, মনে মনে ভাবল, সে কেন মরবে?প্রতাপ তার কে?! অতঃপর প্রতাপ কে জল থেকে উদ্ধার করলেন চন্দ্রশেখর এবং শৈবলিনী কে দেখে

তার রূপে মুগ্ধ হলেন। অবশেষে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর বিবাহ সুসম্পন্ন হলো। কিন্তু শৈবলিনী জানতো -'প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই'। তাই উপক্রমণিকা অংশে পড়ে প্রতাপের ভূমিকা উপন্যাসে ফুরিয়ে গেছে মনে হলেও, আসলে তা হয় না।শৈবলিনী সুখের সন্ধানে আট বছর পরেও প্রতাপকে পাওয়ার জন্য দুঃসাহসিক ভাবে গৃহত্যাগ পর্যন্ত করে।অন্যদিকে প্রতাপও শৈবলিনী ভোলবার ছলনায় সংসার ধর্ম পালনের জন্য রূপসীকে বিবাহ করে। কিন্তু সেও শৈবলিনীকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি কখনো। বাইরের আচরনে ও জীবনযাত্রায় সে তার অন্তরের শূন্যতা ও বেদনাকে আবৃত রেখে তারা সংযম ও সমাজনীতির প্রতি সৎ থাকতে চেয়েছে।শৈবলিনীর প্রতি গভীর প্রণয় জন্য ও চন্দ্রশেখরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশত বেদগ্রাম ত্যাগ করেছিল সে।একথা শৈবলিনীকে সে জানিয়েওছে। তবুও ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি বলে তার হৃদয় বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আলোড়িত হয়েছে।

শৈবলিনী কে তার গৃহে দেখে প্রতাপের মনে হলো যে - 'শ্বেতশয্যার উপরে কে নির্মল প্রস্ফুটিত কুসুম রাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে'।অনেক দিনের কথা তার মনে পড়ল - 'অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মতিথ হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল'।এই বর্ণনা থেকে প্রতাপের দুর্নিবার আকর্ষণের কথা জানা যায়। শৈবলিনী দৃপ্ত প্রণয় কাহিনী তাকে সামাজিক কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলায় সে সেই অবস্থা থেকে পলায়ন করলো। তার ভয় ছিল যে পাছে তার হৃদয়ের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়।

গঙ্গাবক্ষে উভয় সন্তরণ কালে প্রতাপের আনন্দ সাগর আলোড়িত হলো। সে প্রণয়িনীর বাল্যকালের প্রিয় নামে সম্বোধন করল।তারা যেন যুগল প্রেমের স্রোতে অনাদিকালের হৃদয়-উৎস থেকে ভেসে এসেছে বর্তমানকালে।শৈবলিনীর পক্ষে এ অভিজ্ঞতা অপ্রত্যাশিত বলে সে প্রশ্ন করেছে -'আজি মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন'?কথাটি অত্যন্ত ইঙ্গিতবাহী।প্রতাপহীন শৈবলিনীর জীবন মরা গঙ্গার মতই। এ জীবনে আবার প্রতাপের ফিরে আসা চাঁদের আলোর মতোই উজ্জ্বল। প্রত্যুত্তরে প্রতাপ জানালো যে এ চাঁদের বিমোহিনী আলোর মায়া নয়, উদিত সূর্যের আলো। যা ক্ষয়ক্ষতির ঊর্ধ্বে তাদের মিলনের সম্ভাবনাকে কাছে এনে দেয়।এরপরে প্রতাপের মনোভাবের পরিবর্তন সে আর

পাপ জীবনের ভার বহন করতে চায় না। একদিকে ব্যক্তি জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সামাজিক কর্তব্যবোধ, এই উভয়ের দ্বন্দ্বে নির্বাচন করে প্রতাপ শৈবলিনীকে আত্মবিসর্জনের ভীতি প্রদর্শন করে তার কাছ থেকে কঠিন শপথ বাক্য আদায় করে নেয়।শৈবলিনী প্রতিশ্রুতি দান মৃত্যু অপেক্ষাও নির্মম। তার অতীত ও বর্তমান মুছে গেল।শুধু থাকলো মলিন ভবিষ্যৎ। যার রূপ,নেই অস্তিত্ব, আছে অন্ধকার। শৈবলিনীর দুঃখের কথায় প্রতাপ উত্তর দিয়েছে সেও দুঃখী।এই উক্তি তার জীবনের শূন্য তাকেই তুলে ধরে।এই দৃশ্য তাদের আত্মিক মৃত্যুরই।

প্রতাপের আত্মবিসর্জন এর পক্ষে যুক্তি আছে। শৈবলিনী হীন জীবন যাপন তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।অন্যদিকে শৈবলিনী তাকে জানায় - " 'যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে,আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার।কতদিন বসে থাকবে জানিনা। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।' প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া অশ্বে কষাঘাতপূর্বক সমর ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হলেন।"

আসলে প্রতাপ অনুধাবন করেছিল চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সুখের কন্টকরূপ সে। তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতিবন্ধকতা সে।তাই সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে নিতে চেয়েছে তাদের জীবনের পথ থেকে। প্রেমের সঙ্গে মঙ্গলের নিত্য সম্পর্ক তাই প্রতাপ এর নিকট ভালোবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।

রামানন্দ স্বামী অতুলনীয় মনোবল ও আদর্শনিষ্ঠ জন্য তাকে প্রশংসা করে বলেছেন যে ইন্দ্রিয় জয়ে যদি কোন পুণ্য থাকে তবে তার জন্য আছে অনন্ত স্বর্গ।

গোটা উপন্যাস জুড়ে প্রতাপের চরিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রতাপ সম্পূর্ণরূপে আদর্শের পথে হেঁটেছেন, কখনো সেই পথ থেকে একটু বিচ্যুত হলেও তার কর্তব্যবোধ তাকে আবারও আদর্শের পথে ফিরিয়ে এনেছে। তাই শেষ পর্যন্ত শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখরের হাতে অনায়াসে তুলে দিয়ে, তাদের সুখের কথা ভেবে নিজে মৃত্যুবরণ করেছে এবং ট্রাজিক হিরো হয়ে উঠেছে। শেষে তার এই আত্ম বলিদান যেমন

আমাদের মনে গভীর বেদনা, গভীর ট্রাজেডির জন্ম দেয়, ঠিক তেমনি প্রতাপ এর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বেড়ে যায় অনেকটা।এ কারণেই প্রতাপকে উপন্যাসের সার্থক নায়ক বলে মনে হয়।

২.৩ চন্দ্রশেখর

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ও বিচারে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে আদর্শ চরিত্র চন্দ্রশেখর। সম্ভবত সেই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস এর প্রধানতম চরিত্র শৈবলিনী বা প্রতাপের নামানুসারে উপন্যাসের নামকরণ করেন নি।চন্দ্রশেখর উদার ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি গ্রন্থে নিজস্ব কর্ম সাধনার আদর্শ প্রকাশ করেছেন। চন্দ্রশেখর চরিত্র পরিকল্পনায় তারই প্রথম উপস্থাপনা।শৈবলিনীর মতো চঞ্চল হৃদয় তরঙ্গ উচ্ছ্বাসের পরিচয় চন্দ্রশেখরের মধ্যে অনুপস্থিত। তবু এই নম্র ও নীরব,অচঞ্চল মানুষটির চরিত্র অংকন সৌন্দর্যমন্ডিত,সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।ব্রাম্ভণ পন্ডিত বংশে চন্দ্রশেখরের জন্ম।

চন্দ্রশেখর ধর্মজ্ঞ। তপস্যা ব্রতী জ্ঞান সমুদ্রের আরোহণে একান্ত মগ্ন। সেই কারণে বয়স অতিক্রান্ত হলেও তিনি বিবাহ করেননি।বহুদিন পর্যন্ত তাঁর মন খানিকটা সংসার বিমুখ ছিল।কিন্তু ভাগ্য তাঁকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছে। শৈবলিনী যখন নদীবক্ষে আত্মবিসর্জনের সংকল্প করছে, তখন প্রতাপ ডুবেছে। কিন্তু শৈবলিনী ডুবতে পারেনি। আকস্মিকভাবে চন্দ্রশেখর এই পরিবেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন।নৌযাত্রী রূপে তিনি গঙ্গায় নিমজ্জিত হয়ে প্রতাপের প্রাণ রক্ষা করেছেন এবং শৈবলিনী কে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়েছেন।তারপর অতিক্রান্ত প্রায় যৌবনে শৈবলিনীকে বিবাহ করেছেন এবং তাকে নিয়ে গৃহ পরিবেশে এসেছেন বেদ গ্রামে।

সাংসারিক জীবনে চন্দ্রশেখর চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান।কিন্তু শৈবলিনীর সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠেনি।এর একদিকে আছে অদৃষ্ট এবং অন্যদিকে আছে তাঁর নিজের এবং শৈবলিনীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এমন এক নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন যে অন্যপূর্বা।স্বামীর প্রতি ভালোবাসা তো দূর হস্ত হিন্দু নারীর

পতিব্রত্য সংস্কারটুকু নিয়েও শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের জীবনে প্রবেশ করেনি।শৈবলিনী ও প্রতাপকে একই বৃন্তে পুষ্প বলে উল্লেখ করেছেন উপন্যাসিক।সেই বিকশিত পুষ্প দুটির একটি কে বৃন্তচ্যুত করেছেন চন্দ্রশেখর।ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।ওদিকে চন্দ্রশেখর চরিত্র এজন্য কম বেশি দায়ী। দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে স্ত্রীর প্রতি হৃদয়ে প্রেমের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে হয়তো চন্দ্রশেখর এই অন্যপূর্বা রমণীর হৃদয়ের চেয়ে কিছুটা অনুপ্রবেশ করতে পারতেন,কিন্তু তিনি তা করেননি।বরং নিরন্তর জ্ঞান চর্চা ও শাস্ত্র আলোচনার মধ্য দিয়ে তার বিবাহোত্তর দিনগুলি অতিক্রান্ত করেছিলেন।ফলে নব বিকশিত যৌবনময়ী শৈবলিনীর কাছে এই নিস্তেজ পরিবেশ নিতান্ত দুঃসহ বলে মনে হবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষত প্রতাপকে কেন্দ্র করে বাল্য কৈশোরের প্রণয় স্মৃতি তার নিরন্তর করে চলেছিল।সেইসঙ্গে স্বামীগৃহে প্রেমহীন পরিবেশ থাকে গৃহ বিরাগিনী এবং প্রতাপ অনুরাগিণী করে তুলেছিল।চন্দ্রশেখরের হৃদয় দ্বন্দ্বের প্রতি লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চন্দ্রশেখরের মহৎ গুণ এই যে তিনি আত্মসমালোচনা শক্তির অধিকারী। সেই অনুষঙ্গে তাঁর মনে ধারণা হয়েছিল-"আমার যে বয়স তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনী অনুরাগ-অসম্ভব অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই।...আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ- সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।এক্ষণে আমি কি করিব ?এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিবে?"

এর মধ্য দিয়ে চন্দ্রশেখর এর তীব্র হৃদয় দ্বন্দ্ব অনুতাপ সিঞ্চিত আত্মগ্লানির পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু ফস্টারের দ্বারা অপহৃত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ আট বছর শৈবলিনী স্বামীগৃহে সময় অতিবাহিত করেছিলেন। দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষ চেতনার আবরণে হৃদয় উপলব্ধি সীমাবদ্ধ থেকেছে। শৈবলিনী কখন যে কীভাবে তার মনের মধ্যে একটা স্থান করে নিয়েছে তা উপলব্ধি করবার অবকাশ পাননি চন্দ্রশেখর। নবাব মীর কাসেমের আগমনে

চন্দ্রশেখরের স্থানান্তরে যাত্রা এবং সেখান থেকে প্রত্যাগমন কালে চন্দ্রশেখরের মনে হয়েছে -" এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহ-বন্ধে পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই।ওই গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন,এই জন্য আমার এ আল্লাদ?এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম।যদি তাই, তবে কাহারকাহারও প্রতি প্রেম আধিক্য-কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন?সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ।আমার যে তল্পী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন?আর সেই উৎফুল্লকমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন?...যদি অনন্তকাল বাঁচি,তবে অনন্ত কাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকি তে বাসনা করিব।কতক্ষণে আবার শৈবলিনী কে দেখিব?"

কিন্তু এতদিন তার হৃদয়াদেশে শৈবলিনী কে কেন্দ্র করে এই হৃদয় আকুলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি।তার ভালবাসার তরঙ্গ উদ্বেগলতার বহিঃপ্রকাশ বড় একটা ছিল না।স্মিত, শান্ত, স্নেহ, উৎসারণের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝেই তার হৃদয় জগতে উন্মোচন ঘটেছে। চন্দ্রশেখর প্রেমিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে ফস্টার কর্তৃক শৈবলিনী অপহরণের পরবর্তী অধ্যায়ে। বেদনার কঠিন-কঠোর আঘাতে তখন তার হৃদয় স্ফীত প্রেম সত্তা বা প্রেমিক সত্তার আবরণ অপসারিত করে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই বহিরাগত প্রকাশও সংযত,শান্ত ও শোভন।এতদিন পর্যন্ত যে স্থিতধীর শক্তির পরিচয় চন্দ্রশেখর দিয়েছেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই প্রেমিক হৃদয়ের প্রকাশ। চন্দ্রশেখর দীর্ঘকালের সযত্ন, সংগৃহীত ও সংরক্ষিত পুঁথিপত্র অগ্নিশিখায় নিক্ষেপ করেছেন, তাতে ভস্মসাৎ হওয়া দেখেছেন,তারপর গৃহ ত্যাগ করেছেন। সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছে এতদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থরাজিই তাঁর এবং শৈবলিনীর মধ্যে একটা ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকতা রচনা করেছে। এই পুঁথিপত্রর রাজ্যে নির্বাসিত থেকে শৈবলিনীর নিকটে থাকা সত্বেও তিনি তাঁর সঙ্গে ব্যবধান গড়ে তুলেছেন।আর আজ যখন শৈবলিনী নেই তখন চন্দ্রশেখরের কাছে এই বিপুল গ্রন্থরাজির কোন সার্থকতা আর নেই।কাজেই তার থেকে বিসর্জন দিয়ে বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়ে চন্দ্রশেখর সেই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র গৃহত্যাগী চন্দ্রশেখরকে অংশত লোকহিতব্রতী চরিত্র রূপে গড়বার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা তাঁর চরিত্রের কোন বিশিষ্ট গুণ হয়ে ওঠে নি, যা উপন্যাসের

ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখ্য প্রসঙ্গ নয়। চন্দ্রশেখর আদ্যন্ত স্নেহ,কোমল, প্রশান্ত চরিত্র। রামানন্দ স্বামীর সান্নিধ্যে চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে।তাঁরই নির্দেশে চন্দ্রশেখরের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। চন্দ্রশেখর চরিত্র প্রসঙ্গ আলোচনায় রামানন্দ স্বামীর বিষয়টি যেন বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক আরোপিত বলে মনে হয়।তারচেয়েও বড় কথা এর প্রয়োজনীয়তাও প্রশ্নাতীত নয় ।এ প্রসঙ্গে আমাদের যুক্তি এই যে, চন্দ্রশেখরকে যদি ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স ধরে নেওয়া যায় তাহলে তাঁর জীবনে রামানন্দ স্বামীর একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে,এটা মেনে নিতে হয়। চন্দ্রশেখর চরিত্রের পরিণতি সম্পর্কে সমালোচক শ্রী মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন- "বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'চন্দ্রশেখর'। তাহার কারণ চন্দ্রশেখরকে তিনি আদর্শ চরিত্র রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন।কিন্তু সে কল্পনা সফল হয় নাই।প্রানের শান্ত স্রোতে শিলাস্তুপ ভাসিয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখর শ্রদ্ধা অপেক্ষা কৃপার পাত্র হইয়াছে।"কিন্তু শুধুমাত্র হৃদয় বৃত্তিক দুর্বলতার মধ্য দিয়ে সংঘাত আকর্ষণের মধ্য দিয়ে চন্দ্রশেখর শৈবলিনী কে আপন গৃহ পরিবেশে তার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন এমন মনে হয় না। বরং মনে হয় মানস ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে তিনি ক্ষমা করেছেন, তাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করিয়েছেন, নিজেকে এজন্য অপরাধী মনে করেছেন। শৈবলিনীর প্রতি সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, সেই কারণে শৈবলিনীকে পুনরায় গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। আর সহানুভূতি করুণা মিশ্রিত ক্ষমা চন্দ্রশেখর চরিত্রের সঙ্গে যে সাদৃশ্য বাচক তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২.৪ দলনী বেগম

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র দলনী বেগম। দলনী নবাব মীরকাসেমের প্রিয়তমা পত্নী। তার চরিত্রে যে পরিচয় সমগ্র কাহিনী মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে তাতে মনে হয় চরিত্রটির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। আলোর পাশে অন্ধকার যেমন গাঢ়তর প্রতীয়মান হয়, সুখের পাশে দুঃখ যেমন অধিক বেদনাদীর্ণ মনে হয়, শৈবলিনী পাশাপাশি দলনী বেগমের চরিত্রায়নের উদ্দেশ্য তাই। আদর্শ ও কল্যাণ দীপ্ত দাম্পত্য প্রেমের মূর্তিমতী বিগ্রহ দলনী। আর শৈবলিনী বঙ্কিমচন্দ্রের মতে

পাপীয়সী,মানস-ব্যভিচারিণী। দলনীর জ্বলন্ত স্বামী প্রেমের পাশাপাশি শৈবলিনীর মানস ব্যভিচারীতা যে কত নিম্নমানের গ্রন্থ মধ্যে তাই প্রদর্শিত হয়েছে ।

দলনী বেগমের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার মুঙ্গের দুর্গের অভ্যন্তরে। রংমহলের পরিবেশে। অনিন্দ্য রূপ-লাবণ্য,সৌন্দর্য।সেই সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে অশেষ গুণ বৈশিষ্ট্য। নারীসুলভ লাজ বা নম্রতা দলনী বেগমের প্রতিটি পদক্ষেপে সঞ্চালিত। মধুর তার স্বভাব, সুকুমার কোমল হৃদয় ভাব। দলনী সঙ্গীতে ও বীণা বাদনে পারদর্শী। তার কমনীয় চরিত্র হৃদয় মাধুর্য আমাদের কৌতুহল ও উৎকণ্ঠা আকর্ষণ করে। ভাগ্যচক্র একদিন তাকে স্বামীর কল্যাণ ভাবনায় রাজ পরিবেশ থেকে বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছে। তারপর ঘটনা প্রবাহের জটিলতায়, তারই অদৃশ্য ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে পথে পথেই তার জীবন কেটেছে।রাজ পরিবেশে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে আর কোনদিনই সম্ভব হয়নি।তারপর মৃত্যুর যবনিকা তার সমস্ত হৃদয় বেদনার অবসান ঘটিয়েছে। নিয়তি বা Fate তার চরিত্রের নিয়ামক।দলনী চরিত্র Tragedy of Fate, তার চরিত্রের কোনরূপ অসঙ্গতি মানসিক দুর্বলতার পথে তার জীবন বিপর্যয় অভিব্যক্ত হয়নি। নিয়তি বা ভাগ্য এই বিপর্যয় বা ধ্বংসের মূলে।

দলনীর চরিত্র মাধুর্য, হৃদয় সুরভি অনিন্দ্য ও অতুলনীয়। নবাবের বেগম হিসেবে আখ্যান মধ্যে তার উপস্থিতি ও পরিচিতি। তার পূর্ববর্তী জীবনের কথা ও কাহিনী প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো উল্লেখ গ্রন্থের মধ্যে নেই ।শুধু এইটুকু জানা যায় যে তিনি সুদূর ইস্পাহার থেকে আগত। তার ভ্রাতা গুর্গন খাঁ। উভয়েই স্বদেশ থেকে এসেছে। ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে।তবে দলনী কিভাবে নবাবের হৃদয়ে রাজ্যে অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার করেছেন তা জানার কোন উপায় নেই। তবে অনায়াসেই অনুমিত হতে পারে এই অধিকার ও আধিপত্য বিস্তারের মূলে রয়েছে তার অপূর্ব রূপ লাবণ্য, বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা, এবং সংবেদনশীল কোমল চরিত্র।কিন্তু দলনীর জীবনে তার সৌভাগ্য কিভাবে দেখা দিয়েছিল তার কোন বর্ণনা উপন্যাসে নেই।

শৈবলিনীর জীবন বিচিত্রভাবে জীবন দর্শনের সংঘাতে পুষ্ট। প্রতাপকে লাভ করবার আশায় সে দুঃসাহসিক হয়েছে এবং ফস্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে।প্রৌঢ় চন্দ্রশেখরের উপরে তার কোনো আকর্ষণ ছিল না এ ঘোষণা করলেও আমরা জানি যে চন্দ্রশেখর এর প্রতি তার অবচেতন মনে প্রেমের আকর্ষণ ছিল।কিন্তু দলনীর জীবনে আমরা একটি বৃত্তের তরঙ্গ অভিঘাতের পরিচয় পাই।এ বৃত্তটিকে অবলম্বন করে তার ঐকান্তিক পতি প্রেম বিস্তৃতি লাভ করে।যখন তিনি বিপরীত ধর্মী ঘটনার আবর্তে আলোড়িত তখন প্রতিকূল ঘটনা সমূহ তার প্রেমকে গভীরতা ও বিস্তীর্ণতা দান করেছে।

সেনানায়ক ভ্রাতা গুর্গণের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সে কুলসম্ সহ নবাবের বিনা অনুমতিতে রাত্রিবেলা দুর্গে যায়। এর মূলে ছিল তার একটি মাত্র কামনা তা হল গুর্গন কে অনুরোধ করে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের আসন্ন যুদ্ধ বন্ধ করা। নবাব তাকে বলেছিলেন-" আমি নিশ্চিত জানি এ বিবাদে আমি রাজ্য ভ্রষ্ট হইব, হয়তো প্রাণে নষ্ট হইব।" যদি প্রজার 'হিতার্থে' তিনি রাজ্য করতে না পারেন, তবে সেই রাজ্য পরিত্যাগ করবেন।নবাব তার প্রতি গভীর ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেন।আর এই প্রেমের আকর্ষণেই দলনী শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে গুর্গনের উচ্চ আকাঙ্খার জন্য নবাবের প্রতি তার প্রতিকূলতার কথা চিন্তা করতে পারেনি।নবাবের প্রতি দলনীর গভীর আনুগত্যের পরিচয় পেয়ে গুর্গণ নবাবের দুর্গ প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেয়।

রাত্রিবেলায় নবাবের ক্রন্দনরত মহিষী রাজপথে পরিত্যক্তা হয়। তবে তার স্থির বিশ্বাস এই যে ঈশ্বর তার বিচারকর্তা।তার হাতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ হলে সে মৃত্যুবরণ করবে।দলনীর ঈশ্বর নির্ভরতা এবং মানসিক শক্তির কথা এখানে ফুটে ওঠে। দলনী সত্যিই ভাগ্যহতা রমণী।তার জীবনকে নিয়ে নিয়তি খেলা করেছে। সেখানে কোনো বিচার হয়নি, কোন মায়া মমতার চিহ্ন নেই। চন্দ্রশেখর দলনী ও তার পরিচারিকাকে প্রতাপের গৃহে আশ্রয় দেন এবং নবাবের নামে লিখিত দলনীর পত্রকে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেইদিন রাতে ইংরেজরা প্রতাপের গৃহ আক্রমণ করে এবং ফস্টরের স্ত্রী ভেবে দলনীকে অপহরণ করে। নিয়তির নির্মমতা কতদূর মর্মভেদী

হতে পারে তার প্রমান আমরা এই বৃত্তান্ত থেকে অনায়াসে লাভ করি। যেখানে দলনীর পত্র প্রাপ্তিতে নবাব তাকে তার প্রসন্ন প্রাপ্তিতে ক্ষমা করতেন সেখানে নিয়তির নিষ্ঠুর চক্রান্তে তাকে আবার প্রতিকূল স্রোতে ভেসে যেতে হল।

দলনী দ্বিতীয়বার ভুল করল। ফস্টরের নৌকো থেকে সাহসী দলনী ঝাঁপ দিলেন নদীকূলে। তার ধারণা হল যে নিজামতের নৌকো পিছনে আসছে। সে সেখানে অনায়াসে আশ্রয় লাভ করবে। কিন্তু নাবিকেরা তাকে সংক্ষেপে জানালো---'এ নৌকায় হইবে না'।নির্জন প্রান্তরে নদীর অনতিদূরে অসহায় নবাব বেগম পরিত্যক্তা হল।অতঃপর গভীর রাতে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে সাহায্য দানের প্রস্তুতি দিয়ে নিয়ে চলল। সে তাকে নিরাপত্তা দেবে ভেবে প্রেরণ করলেন মহম্মদ তকির গৃহে।নবাবের নিকট বেগম সম্পর্কে এক মিথ্যা সংবাদ পাঠালেন তকি যে বেগম আমিয়টের উপপত্নী রূপে নৌকায় বাস করতেন। তিনি বর্তমানে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন।অমঙ্গলের আশঙ্কায় বেগমকে উদ্ধার করে সেই দীর্ঘাকৃতি পুরুষ তাকে নবাবের গৃহে পাঠান নি কারণ তিনি তার ভবিতব্য জানতেন কিন্তু বেগম বলল যে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ নবাব কে দেখার আশা তিনি ছাড়বেন না।'দলনী পতঙ্গ বহ্নি মুখ বিবিক্ষু হইল'।তকি তাকে নবাবের রোষ থেকে বাঁচাবেন। কিন্তু তার প্রস্তাব হলো যে বেগমকে তাকে বরণ করতে হবে। নবাবের পরোয়ানা এলো যে বিষপানে বেগমকে বধ করতে হবে।পতির আদেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য সে বিষপান করল। মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করল। দলনীর পতিনির্ভরতা এত গভীর যে সে সানন্দে বিষ পান করল।"আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব।কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না এই আমার দুঃখ।সে কাঁদতে কাঁদতে আরো বলল -'তোমার ক্রোধই আমার বিষ-তুমি যখন রাগ করিয়াছ- তখন আমি বিষ পান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা'।" নিয়তির চক্রান্তে একটি প্রফুল্ল কুসুম ঝরে পড়ল।দলনীর দুঃখ হলো যে সে নবাবের প্রেম স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।তার জীবনে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস তার প্রতি আমাদের করুণা এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মেটারলিঙ্কের Luck নামক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করে

নিয়তির অত্যাচারের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন।টমাস হার্ডির উপন্যাসে আমরা নিয়তির নির্মমতার পরিচয় পাই।উপন্যাসের নায়িকা Tess ভাগ্যহতা রমণীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।তবে বঙ্কিমী-সাহিত্যে এই জাতীয় দুর্ভাগিনী নারী চরিত্র বিরল।

২.৫ মীরকাসেম

মীরকাসেম একটি ঐতিহাসিক চরিত্র।বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।ইতিহাসের পটভূমি থেকে মীরকাসেম চরিত্রটিকে তিনি তুলে এনেছেন।মীরকাসেম বাংলা ,বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব।বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চরিত্র অঙ্কনে ইতিহাস কে অনুগতভাবে অনুসরণ করেছেন।তাঁর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ছবিও তুলে ধরেছেন।অন্যদিকে তিনি উপন্যাসে গৌণ কাহিনীর নায়ক।সেখানে তাঁর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনা ব্যর্থতার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।

ইতিহাস ও মানব জীবন এই দুটি ধারা তাঁর জীবনে আশ্রয় লাভ করেছে।এই কারণেই তাঁর চরিত্র বড়ই আকর্ষণ করে আমাদের।

মীরজাফরকে গতিচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীরকাসেমকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব রূপে সিংহাসনে বসান ইংরেজরা। কিন্তু তারা চান নবাব কে তাদের হাতের পুতুল করে রাখতে।তাদের দাবি হলো রাজা তারা,কিন্তু পীড়নের দায়িত্ব মীরকাসেমের। তাদের হয়ে নবাবকে অত্যাচারীর ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু মীরকাসেমের সংকল্প হলো যদি তিনি প্রজাহিতৈষী না হন, তবে তিনি রাজ্যভার ত্যাগ করবেন।

তাঁর মতে," আমি সিরাজউদ্দৌলা নহি বা মীরজাফর নহি" ।তিনি জানেন যে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ অনিবার্য।এর ফলে তিনি রাজ্য ভ্রষ্ট হবেন, হয়তো তার প্রাণও যাবে।কিন্তু তাও তিনি প্রজাপীড়ন করতে পারবেন না।তিনি দূরদর্শী, আসন্ন সংঘাতের ইঙ্গিত পেয়েছেন,তাই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।বিনা প্রতিবাদে তিনি দেশকে বিদেশি বণিকদের হাতে তুলে দিতে চান না।তারা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করে প্রভূত ধন অর্জন করবেন ও

দেশীয় ব্যবসায়ীগণ করের দায়ে জর্জরিত হবে এই অবিচারমূলক বৈষম্য নবাব মেনে নিতে রাজি হননি।তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। প্রাণাধিকা বেগম দলনীর অনুরোধে সংকল্পচ্যুত না হয়ে আপন সিদ্ধান্তে নির্ভীক চিত্তে স্থির থেকেছেন।যুদ্ধক্ষেত্রে কাটোয়া,গিরিয়া এবং উদয়নালায় নবাব পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু তার দায় নবাবের নয়,বা সৈন্যদলের অশিক্ষা বা ভীরুতা নয়। সেনানায়ক গুর্গণ খাঁ মূলত এর জন্য দায়ী।

ভাগ্য অন্বেষণে গুর্গন এবং তার ভগিনী দৌলতউন্নেসা ইস্পাহান থেকে বাংলাদেশে আসে।প্রথমে দৌলতউন্নেসা নবাবের বাঁদী রূপে স্থান পেলেও পরবর্তীকালে তিনি হচ্ছেন নবাবের প্রিয়তমা বেগম দলনী।গুর্গন ক্রমে উচ্চ স্থান অধিকার করে এবং ক্রমশ ক্ষুদ্র নবাব হয়ে ওঠে এবং মীরকাসেমকে গদিচ্যুত করে বাংলা নবাব হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তার উপর নবাবের বিশ্বাস অন্য রাজকর্মচারীদের অসন্তুষ্ট করে।যে অসন্তোষ এর ফলাফল যুদ্ধ খানিকটা পড়েছিল বলে মনে করা হয়।

মীর কাসেম চরিত্রের অপর দিক হলো তার প্রেমের আদর্শ একনিষ্ঠতা।এই ক্ষেত্রে তিনি ভাগ্যহত। দলনীকে তিনি অন্তর থেকে ভালোবেসে ছিলেন।এই প্রেমে উদ্দমতা ও প্রগলভতা ছিল না।ছিল সংযম ও নিষ্ঠা।

দলনী যুদ্ধের আভাস পেয়ে নবাবের মঙ্গল কামনায় রাত্রিবেলা গুর্গণের দুর্গে পরিচারিকাসহ যান এবং তাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। গুর্গণ তাকে না বুঝে বলে যে "তুমি ভারতের দ্বিতীয় নুরজাহান হবে। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে।" ক্রোধান্বিত দলনী তাকে জানান- "আজি থেকে তোমার সঙ্গে আমার শত্রু সম্বন্ধ" ।অতঃপর কৌশলে গুর্গণ নবাবের দুর্গে দলনীর প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেয়। একের পর এক দুর্ভাগ্য এসে দলনীকে তকি খাঁ-র আশ্রয়ে প্রেরণ করে।তখন নবাবের চতুর্দিকে

দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর স্থির বিচারবুদ্ধি তখন আচ্ছন্ন।এই সময় তকি খাঁ-র মিথ্যে প্রতিবেদন আসে যে দলনী আমিয়টের উপপত্নী।"জলন্ত অগ্নি ঘৃতাহুতি পড়িল" ।ইংরেজরা অবিশ্বাসী,সেনাপতি অবিশ্বাসী,মনে হচ্ছে। রাজলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী, দলনীও তাই ।নবাব আর বিবেচনা করতে না পেরে দলনীকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। নবাবের আদেশে,তকি খাঁ-র প্রগলভ কামনা প্রকাশের জন্য তাকে পদাঘাত করে, হাসিমুখে বেগম বিষপাত্র তুলে নিলেন।নবাব যুদ্ধে ভীত ছিলেন না তিনি নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধের পরিণতি উপলব্ধি করে ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তিনি তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হলেন। এই পরাজয়ের পশ্চাতে কার্যকরী ভূমিকা ছিল গুর্গণের বিশ্বাসঘাতকতার,জাতীয় চরিত্রে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের,ও রাজ কর্মচারীদের প্রতিকূল মনোভাবের।

মীরকাসেমের চরিত্রে একদিকে আছে তাঁর রাজনৈতিক জীবন,অন্যদিকে দলনী বেগমের প্রতি গভীর প্রেম।এই দুটি ধারা মিলে তাঁর চরিত্রকে মানবিক মূল্য দান করে।তিনি বেগমকে হারান এবং বৃহৎ সাম্রাজ্যে রাজদণ্ড তার হাত থেকে স্খলিত হয়। পরে কুলসমের কাছ থেকে সমস্ত কাহিনী শুনে তিনি হাহাকার করে ওঠেন।"তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কীটকে যত্ন করিয়াছেন-কুলসম্ সত্যই বলিয়াছে।বাংলার নবাব মূর্খ।"গভীর শোকে আচ্ছন্ন মীরকাসেম বললেন যে সত্যই তিনি মূর্খ। ওমরাহদের সম্মোধন করে তিনি বললেন যে,তারা যেন সুবা রক্ষা করেন ,তিনি চলে যাচ্ছেন। হয় তিনি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকের মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন অথবা ফকিরি গ্রহণ করবেন।নবাবের শেষ অনুরোধ ইংরেজরা বা তার অনুচর বর্গ তাঁকে সিরাজউদ্দৌলার মতো হত্যা করে তবে তাঁর প্রার্থনা হল যে তাঁরা যেন তাঁকে দলনীর কবরে নিকট কবর দেন।তারপর শূন্য ঘরে নবাব তাঁর কণ্ঠের মুক্তোর হার ছিঁড়ে ফেললেন।রত্নখচিত বেশ দূর করলেন এবং দলনীর নামোচ্চারণ করে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

মীরকাসেমের চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ইতিহাসের সঙ্গে যখন মানব জীবন কাহিনী মিশ্রিত হয়,তখন ঐতিহাসিক রসের অভিব্যক্তি ঘটে।এই রস হলো ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ।বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসেমের চরিত্রের ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটাতে চেয়েছেন।মানবিক গুণসম্পন্ন এই চরিত্রটি আমাদের মনকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করে। মীরকাসেম উপ কাহিনীর নায়ক।আবার অন্যদিকেপরোক্ষভাবে তিনি মূল কাহিনীর মধ্যে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছেন।ফলে চরিত্রটি আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গৌণ চরিত্র

২.৬ রমানন্দ স্বামী

রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখর উপন্যাসের গৌণ চরিত্র হলেও চরিত্রটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শৈবলিনীর অপহরণের পরে চন্দ্রশেখর তাঁর বহু যত্নে সংগৃহীত,প্রিয় গ্রন্থগুলিকে আগুনে নিক্ষেপ করে গৃহত্যাগ করলেন। তখন মুঙ্গেরে তাঁর সঙ্গে এক মঠে রমানন্দ স্বামীর দেখা হয়। তিনি জ্ঞানী পুরুষ।অনেকের মতে তিনি সিদ্ধপুরুষ।তাঁর সম্পর্কে প্রবাদ হলো তিনি ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞান সকলই আত্মস্থ করেছেন। দুঃখে সন্তপ্ত শিষ্য চন্দ্রশেখরকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে দুঃখ বলে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নেই। সুখ-দুঃখ বিজ্ঞের কাছে একই।যদি প্রভেদ করবার চেষ্টা করা হয় তবে দেখা যাবে যাঁরা পুণ্যাত্মা বা সুখী তাঁরা চির দুঃখী। সুরলোকও দুঃখ-পূর্ণ।যিনি দয়াময় তিনি অনন্ত সংসারের অনন্তকালীন দুঃখে অনন্তকাল দুঃখী। যদি তিনি নির্বিকার হন তবে তাঁকে স্রষ্টা বিধাতা

বলে মানা যায় না। কেননা বিধাতা নির্বিকার হতে পারেন না।তিনি দুঃখময় এ কথাও যথার্থ নয়।কারণ তিনি নিত্যানন্দ।সুতরাং সিদ্ধান্ত হল এই যে, দুঃখ বলে কোন কিছু নেই।রামানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে নিষ্কাম কর্মে দীক্ষা দিলেন।এই তথ্যটি পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "ধর্মতত্ত্ব"-এ ব্যাখ্যা করেছেন। এবং তা ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে প্রদান করেছেন।রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরের নিকটে জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে,একমাত্র পরোপকারীরাই সুখী।অন্য কেউ সুখী নয়। রামানন্দ স্বামী তাই জীবনের মূল্যবোধের প্রতীক রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন।এই পরোপকার বৃত্তি পালনের মন্ত্র চন্দ্রশেখর তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।যে সমাজ নীতির ব্যাখ্যা রূপে আমরা এই জ্ঞানী অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মুক্ত পুরুষকে উপন্যাসের মধ্যে পাই,তা বিস্ময়কর,সন্দেহ নেই।কিন্তু তাঁর কর্মধারা চন্দ্রশেখরের কল্যাণ চিন্তার পার্থিব উন্নতি ও মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যয়িত হওয়ায় মনে হয় যেন শক্তির অপব্যয় ঘটেছে।পাপের সংশোধনের কারণে প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ঘটনা শৈবলিনীর ক্ষেত্রে রমানন্দ স্বামীর নির্দেশে ব্যবহৃত হয়।মনে হয় যেন তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক রাজ্য ত্যাগ করে সংসার জীবনের ক্ষেত্রে নিজেকে বেশি পরিমাণে জড়িয়ে ফেলেছেন। তিনি শৈবলিনীকে অত্যন্ত কঠিন প্রায়শ্চিত্ত পর্ব সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।তাঁর অলৌকিক শক্তির দ্বারা শৈবলিনীকে রোগ মুক্ত করে তাঁকে সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন।যোগ বল প্রভাবে তিনি ফস্টরের কাছ থেকে শৈবলিনী সম্পর্কে তার অকপট উক্তি শুনে বিশ্বাস করেছেন যে শৈবলিনী নিষ্পাপ।চন্দ্রশেখরও শৈবলিনীকে গৃহে স্থান দিলেন। কিন্তু তাঁর দুঃখ এই যে সুখ তাঁর কপালে নেই।

শৈবলিনীকে তিনি রোগমুক্ত করেছেন বটে কিন্তু তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সত্বেও তাঁর প্রতাপ সম্পর্কে দুর্বলতা দূর করতে পারেননি। মৃত্যুপথযাত্রী প্রতাপের নিকট থেকে তিনি জানতে পারলেন তাঁর আদর্শের কথা।শৈবলিনীকে ষোলো বছর ধরে ভালোবেসেছেন কিন্ত তাঁর মধ্যে কোন পাপাসক্তি নেই। কারণ তাঁর ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। শৈবলিনীর প্রতি তাঁর অনুরাগের কোন মঙ্গল নেই জেনে সে দেহ পরিত্যাগ করল। রমানন্দ স্বামী তাঁর এই মনোভাবের প্রশংসা করে মন্তব্য

করেছেন যে, সে অমরায় স্বর্গসুখ ভোগ করবে। তিনি বলেছেন যে যদি চিত্ত সংযোগে কোন পুণ্য থাকে তবে অনন্ত স্বর্গ তাঁর। সুতরাং উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও পরিণতিতে রামানন্দ স্বামীর দান উল্লেখ্য। তাই গৌণ চরিত্র হয়েও তাঁর ভূমিকা গৌণ হয়নি।তিনি উপন্যাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

২.৭ গুর্গণ খাঁ

"চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের উপ কাহিনীর গৌণ চরিত্র গুর্গণ হলেও উপকাহিনীর ঘটনাকে গুর্গণই ত্বরান্বিত করেছে।তার চক্রান্তেই উপকাহিনীর নায়ক-নায়িকার জীবনে ট্রাজেডি নেমে এসেছে।

লরেন্স ফস্টর শৈবলিনীর জীবনের বিপর্যয়ের জন্য পরোক্ষভাবে যেমন দায়ী, তেমনই গুর্গণ তার ভগিনী দলনীর নিদারুণ বিপর্যয়ের জন্য প্রত্যক্ষ রূপে দায়ী।

জাতিতে আর্মানী, ইস্ফাহানে তার জন্ম।ভাগ্য অন্বেষণের জন্য সে তার ভগিনীর সঙ্গে বাংলাদেশে আসে।প্রথম জীবনে সে ছিল বস্ত্র ব্যবসায়ী। একদা সে গজ মেপে কাপড় বিক্রি করতো। সুপ্রসন্ন ভাগ্যের সহায়তায় নবাব মীরকাসেমের আনুকূল্যে ও কিছুটা নিজস্ব প্রতিভার গুনে হয়ে উঠল নবাবের প্রধান সেনা নায়ক। গোলন্দাজ বাহিনী সৃষ্টি করে ও তাদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে উৎকৃষ্ট কামান বন্দুক নির্মাণ করে সে হলো নবাবের পরে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি।নবাব আস্থা ছিল তার ওপরে অপরিসীম। অন্যান্য কর্মচারীরা এই কারণে ছিল ক্ষুব্ধ। নবাব মনে করতেন যে কুশলী সেনানায়ক গুর্গণের সহায়তায় তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন।কিন্তু গুর্গণের মনে তখন প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা।সে মনে করতে লাগলো সে-ই বাংলার কর্তা।মীরকাসেমকে সে গ্রাহ্য করে না।যেদিন সে মনে করবে সেদিন তাকে মসনদ থেকে টেনে ফেলে দেবে।মীরকাসেম তার উচ্চপদের আহরণের সোপান---" এখন ছাদে উঠিয়াছি।মই ফেলিয়া দিতে পারি।" কাঁটা হলো একমাত্র ইংরেজরা।তারা তাকে হস্তগত করতে।সে চায় তাদের হস্তগত করতে।মীর কাসেমের সহায়তায় ও তাঁর সহায় হয়ে সে ইংরেজ লুপ্ত

করবে।এই উদ্দেশ্যে সে উদ্যোগ করে যুদ্ধ বাঁধিয়েছে। এই পথই সুপথ।বাংলার রাজলক্ষ্মী তার প্রতি সুপ্রসন্ন হবে।

গুর্গণ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হল। তার মধ্যে কোন নীতিবোধ নেই,আদর্শ নেই।আছে শুধু প্রচন্ড উচ্চ অভিলাষ।যেখানে নবাব মীরকাসেম সুখভোগ- বিলাস ত্যাগ করে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য,পরিণামে অমঙ্গল জেনেও ঘোর বিপদের মধ্যে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন,আমিয়টর প্রভৃতি ইংরেজগণ ইংল্যান্ডের জয় পতাকা উড্ডীন করার অভিপ্রায় দেশের গৌরবের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুকে নির্ভীক চিত্তে বরণ করেন সেখানে গুর্গণ একান্তরূপে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক।গুর্গণের মনে ভগ্নী দলনীর জন্য কোনো দয়া মায়া স্নেহ নেই।নবাবের বিপদের চিন্তায় তাঁকে রক্ষার জন্য দলনী নবাবের বিনা অনুমতিতে তার কাছে ছুটে এসেছে।যাতে সে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়।স্বামী প্রেমের গভীরতাগুর্গণের কাছে বোধগম্য হয় না।সে অনায়াসে ভগ্নিকে জানায় যে,এক স্বামী গেলে অন্য স্বামী হতে পারবে। আশ্বাস দেয়,"তুমি একদিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হবে"।স্বামী স্ত্রীর প্রণয় বন্ধন, শুভাশুভ বিদিত নয় বলে সে অনায়াসে বলতে পারল স্বামী কারো চিরকাল থাকে না।এক স্বামী গেলে আরেক স্বামী হতে পারে।ক্রুদ্ধ দলনী গুর্গণকে জানালো---"আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রু সম্বন্ধে।আমি জানিব যে তুমি আমার পরম শত্রু।তুমি জানিও আমিও তোমার পরম শত্রু।"নির্মম হৃদয় গুর্গণ চিন্তা করল যে দলনী স্বামীর মঙ্গলের জন্য তার অমঙ্গল সাধন করতে পারে।সুতরাং সে নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে দলনীকে আর দুর্গে প্রবেশের সুযোগ দিল না।সেই রাতে অসহায় ভগ্নীর অবস্থা শোচনীয় হতে পারে সে চিন্তা গুর্গণকে বিব্রত করলো না।দলনী দুর্গদ্বার বন্ধ দেখে "ছিন্নবল্লরীবৎ ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।" গুর্গণ যে স্বার্থান্ধ শয়তানের কাছে বিক্রীত এই সত্য তার আচরণের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত।

২.৮ কুলসম

দলনী বেগমের পরিচারিকা কুলসম উপন্যাসের গৌণ চরিত্র হলেও তার জীবন সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বৃহৎ ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করে সে তা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছে। দলনীর সে শুধু পরিচারিকা নয়,সে তাঁর বন্ধুত্বের অধিকার অর্জন করেছে।তার কথাবার্তার মধ্যে বুদ্ধি ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।দলনী তাকে দুঃসাহসিক কাজের ভার দিয়েছে।একটি পত্র গোপনে গুর্গণ খাঁ-র হাতে পৌঁছে দেওয়া। কাজের প্রকৃতি দেখে সে তার স্বভাব হাসি তামাশা থেকে বিরত থেকেছে।কোন পুরুষ মেয়ে মানুষের চাতুরি ধরতে পারে না,এই হল তার অভিজ্ঞতা।কিন্তু সে জানে নবাব আলিজা অন্য পুরুষের মতো নয়।নবাব জানতে পারলে উভয়ের মৃত্যু ঘটবে।তবুও বেগমের প্রতি আন্তরিক থেকে সেই পত্র নিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে।তাদের দুর্গ প্রবেশ নিষিদ্ধ হলে দলনী কাঁদতে লাগলেন।তাঁর কাজের একমাত্র বিচারক ঈশ্বর।নবাবের বিচারে মৃত্যুদণ্ড হলে তিনি তা মেনে নেবেনেবেন। কুলসমের বিশ্বাস এত গভীর নয়।তাও সে দলনীকে একা ফেলে চলে যায়নি।

শৈবলিনী ভেবে দলনী কুলসুম সহ প্রতাপের গৃহ থেকে অপহৃতা হয়।ফস্টরের নৌকোয় তারা কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে দলনী তাঁদের তীরে নামিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে ফস্টর সম্মত হয়।দলনীর ধারণা ছিল পেছনে নিশ্চয়ই নিজামতের নৌকো আসছে। কুলসুম নবাবের ভীতির কারণে নামল না।সে কলকাতায় যাবে। সেখানে তার অনেক জানাশোনা ব্যক্তি আছে।কুলসমের ভীতির কারণ হলো নবাবের সম্ভাব্য দণ্ডদান।ফস্টরের প্রতি আকর্ষণের কারণে নয়।তবে সে পরে নবাবের কাছে বলেছে---"আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গির দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি---মনে করিয়াছিলাম---সে কথা যাউক"।তার সমবেদনার কারণ নিছক ফস্টরের অসুস্থতা ও অসহায়তা দর্শনে নিছক দুঃখবোধের কারন থেকে পৃথক হতে পারে।তবে সে পরে ফস্টরকে সাধ্য সাধনা করেছে তাকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য।ফস্টর রাজি হয়নি।কলকাতায় দয়ালু হেস্টিংস সাহেব তার কথা শুনে তাকে নবাবের কাছে পাঠিয়ে

দেন।মনে হয় কুলসুমের কার্যের পশ্চাতে আছে তার সাময়িক ভ্রান্তি ও বিচার বুদ্ধির মূঢ়তা।

নবাবের কাছে দলনীর কার্য ও নিষ্পাপ চরিত্রকে সমর্থন করে তাঁর মৃত্যুর জন্য নবাবকে দায়ী করে তাঁকে সুবে বাংলা বিহারের মূর্খ নবাব রূপে অভিহিত করেছে। তার নির্ভীক উক্তি প্রমাণিত করে তার চরিত্রের আনুগত্য, আন্তরিকতা ও স্পষ্টবাদিতা।গৌণ চরিত্র হলেও দলনী ও নবাবের চরিত্রকে পরিস্ফুট করে তুলতে সাহায্য করেছে কুলসম।

২.৯ লরেন্স ফস্টর

লরেন্স ফস্টর বঙ্কিমচন্দ্রের এক কাল্পনিক সৃষ্ট চরিত্র। ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে সংযুক্ত হয়ে সে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

সে যুগে যেসব ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে তারা দুটি বিষয় অক্ষম ছিলেন। প্রথমত, তারা লোভ সংবরণ করতে জানতো না,দ্বিতীয়তঃ তারা পরাভব স্বীকারে অক্ষম ছিল। এই কারণে বেদগ্রামে সুন্দরী শৈবলিনীকে দেখে সে মুগ্ধ হলো।এর মূলে ছিল তার ইন্দ্রিয়-লালসা।

ফস্টর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুরন্দরপুরের রেশমের কুঠির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিল। বিশেষ কাজে নিযুক্ত করবার জন্য তাকে কলকাতায় আহবান করা হয়।সে সময় ইংরেজদের ধর্মবোধ ছিল না। ফস্টর স্থির করলো Now or Never অর্থাৎ পুরন্দরপুর ত্যাগের পূর্বে শৈবলিনীকে অপহরণ করা প্রয়োজন। স্থুল বুদ্ধি ইংরেজ এই কথাটি বুঝেছিল শৈবলিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তাকে লাভ করা সহজ হবে।অপহরণের পূর্বে অবশ্য সে লোক পাঠিয়ে শৈবলিনীর সম্মতি লাভ করেছিল। কিন্তু এর মূলে অন্য কোনো মনোভাব শৈবলিনীর থাকতে পারে সে কথা ভাববার অবকাশ ছিল না। শৈবলিনী তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ছুরি প্রদর্শন করে করেছিল।এরপরে আর শৈবলিনীর প্রতি বলপ্রয়োগে সচেষ্ট হয়নি ফস্টর। কলকাতার কাউন্সিল নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মনস্থ করেছিল। এ কারণেই আজিমাবাদের কুঠিতে অস্ত্রপ্রেরণ আবশ্যক

হয়ে উঠেছিল। সেখানকার কুঠির অধ্যক্ষ সাহেবকে কিছু উপদেশ পাঠানোর প্রয়োজন ছিল। আমিয়ট নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মেটাবার জন্য মুঙ্গেরে ছিলেন।তার কাছ থেকে কিছু জানতে না পারলে ইলিসকে নির্দেশ দেওয়া যাবে না।অতএব প্রয়োজন একজন চতুর কর্মচারী।গভর্নর ভান্সিটার্ট এই উদ্দেশ্যে ফস্টরকে এনেছিলেন। এতে বোঝা যায় যে ফস্টরের মধ্যে রাজনৈতিক চাতুর্য ছিল।আমিয়টের সঙ্গে কথাবার্তায় স্থির হলো যে নবাব যদি অস্ত্র বোঝাই নৌকা ছেড়ে দেন তাহলেই ভালো।নচেৎ ফস্টর অস্ত্রের নৌকা ফেলে পাটনায় যাবেন।কিন্তু তার জন্যে নির্দিষ্ট ছিলো ভাগ্যের বিরূপতা।তার ধারণা ছিল যে কোন দেশি লোক ইংরেজদের উদ্দেশ্যে গুলি বর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু রামচরনের গুলিতে ফস্টর মস্তকে আহত হয় গঙ্গা স্রোতে ভেসে গেলেন।পরে তাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়।গঙ্গাবক্ষে সন্তরণা শৈবলিনীকে দেখে শীর্ণ,দুর্বল রুগ্ন ও উত্থানশক্তিহীন ফস্টর চিৎকার করে উঠল---"পাকড়ো।হামারা বিবি।" ফস্টরের পরমায়ু ছিল সে।চিকিৎসায় বেঁচে উঠলো কিন্তু তার পূর্বের সাহস ও দম্ভ তার আর ছিল না।মস্তিষ্কে আঘাতের জন্য তার বুদ্ধিও কিছু বিকৃত হয়েছিল।তা না হলে সে কখনোই নির্জন নদীর তীরে দলনীকে তার মানসিক ভয়ের কারণে নামিয়ে দিত না।

ওয়ারেন হেস্টিংস ন্যায়নিষ্ঠ ও দয়ালু গভর্নর। তিনি ফস্টরের অপরাধের অনুসন্ধান করে ও তার স্বীকারোক্তি শুনে তাকে পদচ্যুত করলেন। কিন্তু ফস্টর ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। তাই সে তার নাম পরিবর্তিত করে সমরুর অধীনে নবাব পক্ষে যোগদান করল। সে জন স্ট্যালবার্ট নামে নিজের পরিচয় দিল।কুলসুম তাকে সনাক্ত করায় আমির হোসেন তাকে গ্রেফতার করে নবাবের কাছে নিয়ে গেল।নবাবের দরবারে ফস্টর শৈবলিনীকে সনাক্ত করল।কিন্তু সে চন্দ্রশেখরের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হল না। নবাব তাকে কুকুরের দংশনে মৃত্যুর আদেশ দিলেন।সে বিচলিত হয়ে পড়ল এবং নবাব এর কাছে অন্য প্রকার মৃত্যুর প্রার্থনা জানান। রামানন্দ স্বামীর অলৌকিক যোগবলের প্রভাবে শৈবলিনী সম্পর্কে অকপটে সমস্ত কথা জানাল।এতে জানা গেল যে শৈবলিনী সত্যি নিষ্পাপ। ফস্টরের কাহিনী এখানেই সমাপ্ত হয়।শৈবলিনীকে অপহরণের জন্য তাকে ঠিক দুর্বৃত্ত বলা চলে না। কেননা এর পেছনে ছিল শৈবলিনীর সম্মতি।তবে

সে স্বার্থপর ও নিচ মনের ব্যক্তি।তবুও সে নবাবের দরবারে ইংরেজ সুলভ নির্ভীকতার পরিচয় দান করেছে।তার সম্পর্কে তাই পাঠক মনে কিঞ্চিত করুণামিশ্রিত অনুকম্পা জেগে ওঠে।

২.১০ তকি খাঁ

ইতিহাসে তকি খাঁ-র চরিত্র নির্ভীক ও আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ।সে নবাবের অত্যন্ত অনুগত এবং যুদ্ধে সে মৃত্যুবরণ করেছে।কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তার চরিত্রে ঐতিহাসিক পরিচয় বহু অংশে পরিবর্তিত করেছেন।গুর্গণের মনে যেমন প্রথম থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ছিল তকির ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। বরং সে প্রথম পর্যায়ে বিশ্বাসী রাজকর্মচারী রূপে তার পরিচয় দিয়েছে, ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে তার সাহসিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছি।কিন্তু তার পরে তার মধ্যে দেখা যায় কর্তব্য পালনে অবহেলা।নিজের বিপদের আশঙ্কায় তকি দলনীর নামে অত্যন্ত কুৎসাপূর্ণ প্রতিবেদন পাঠায়।সে জানিয়েছিল যে আমিয়টের নৌকায় উপপত্নী হিসেবে দলনী বাস করছে। তখন মীরকাসেমের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়েছে।গুর্গণ খাঁ অবিশ্বাসী তা প্রকাশিত হয়েছে। নবাবের বুদ্ধি তখন বিকৃত।সেই সময়ে প্রতিবেদন এলো দলনী বিশ্বাসঘাতিনী।নবাব তকিকে নির্দেশ দিলেন দলনী কে বিষপানে হত্যা করতে।

তকি তখন দলনীর রূপ দর্শনে উন্মত্ত।সে তাঁকে বলেছে যে তাকে ভজনা করলে বিষ পান করতে হবে না দলনীকে।দলনী তকিকে পদাঘাত করলেন।করিমন নামে এক পরিচারিকা অর্থের বিনিময়ে দলনীকে বিষ এনে দিল।এই সংবাদ শুনে তকি যখন উপস্থিত হল তখন দলনী বিষ পান করেছেন।তিনি তকিকে বললেন----"আমি তোমার মত নিমকহারাম নহি।প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি।তোমার উচিত অবশিষ্ট পান করিয়া আইস।"

কুলসমের আন্তরিক উক্তি থেকে নবাব জানতে পারলেন দলনীর মৃত্যু ও তকির বিশ্বাসঘাতকতার কথা। ইব্রাহিম খাঁকে তিনি ভার দিলেন তার কাছে তকিকে আনবার জন্য।তকি কুলসুমের অভিযোগ অস্বীকার করলেন।কিন্তু কুলসমের অভিযোগের মধ্যে

এমন এক নির্ভীকতা, আন্তরিকতা ছিল যে তার অস্বীকৃতি তকির অপরাধকে প্রমাণিত করল। ফস্টর যা জানতো তা বিবৃত করল।"তাহাতে সকলেই বুঝিল দলনী অনিন্দনীয়া"।

অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ইংরেজদের গোলা নবাবের শিবিরের ওপরে পড়তে লাগলো।সকলে সেখান থেকে দ্রুত পথে বেরিয়ে পড়ল।নবাব তাঁর তরোয়াল দিয়ে তকিকে নিজের হাতে হত্যা করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের প্রয়োজনে তকির চরিত্র পরিবর্তিত করেছেন।এই পরিবর্তন ইতিহাস বিরোধী হলেও তা বিশ্বস্তভাবে অঙ্কিত হয়েছে।পরিবেশ ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে।ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক কাহিনীর প্রয়োজনে গৌণ চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন বা পরিবর্তিত করতে পারেন।তকি চরিত্র সম্পর্কে যে পরিবর্তন ঔপন্যাসিক করেছেন তাতে তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. চন্দ্রশেখর উপন্যাসের তিনটি মূল চরিত্রের নাম লেখ।

উত্তর-চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মূল চরিত্র গুলি হল চন্দ্রশেখর,শৈবলিনী,প্রতাপ।

২. চন্দ্রশেখর উপন্যাসের তিনটি গৌণ চরিত্রের নাম লেখ।

উত্তর-চন্দ্রশেখর উপন্যাসের তিনটি গৌণ চরিত্রের নাম হল রমানন্দ স্বামী,গুর্গণ খাঁ,কুলসম।

৩. কুলসমের পরিচয় দাও।

উত্তর-দলনী বেগমের পরিচারিকা কুলসম উপন্যাসের গৌণ চরিত্র হলেও তার জীবন সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বৃহৎ ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করে সে তা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছে। দলনীর সে শুধু পরিচারিকা নয়,সে তাঁর বন্ধুত্বের অধিকার অর্জন করেছে।তার কথাবার্তার মধ্যে বুদ্ধি ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

মন্তব্য

২.১১ চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি প্রতাপ শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের জীবনের টানাপোড়েনের গল্প-ব্যাখ্যা করো।

২. চন্দ্রশেখর উপন্যাস রামানন্দ স্বামীর ভূমিকা সম্পর্কে লেখ।

৩. চন্দ্রশেখর উপন্যাস পার্শ্ব চরিত্র গুলির ভূমিকা আলোচনা করো।

৪. চন্দ্রশেখর উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র প্রতাপ---- আলোচনা করো।

৫. চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মীর কাসেমের ভূমিকা আলোচনা করো।

৬. চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দলনী বেগমের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা-ভূদেব চৌধুরী।

২. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত-অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. "চন্দ্রশেখর" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলোচনা-মিলন রায়।

৪. উনিশ শতক-অলোক রায়।

৫. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-ড. সুকুমার সেন।

৭. 'চন্দ্রশেখর' আলোচনা-বিদিশা সিনহা।

একক ৩ চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা

বিন্যাসক্রম

৩.১ নামকরণের সার্থকতা

৩.২ দুই কাহিনীর ঐক্য স্থাপনে সার্থকতা

৩.৩ আধুনিক উপন্যাসের সার্থকতা

৩.৪ প্রায়শ্চিত্ত পর্বের ব্যর্থতা

৩.৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ নামকরণের সার্থকতা

"চন্দ্রশেখর" উপন্যাস প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেম-কাহিনী।উভয়ের আর্কষণ ও বিকর্ষণ নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে।নায়কের বয়স ষোল ও নায়িকার বয়স আট।বাল্যপ্রণয়ের আর্কষণ যত গভীর হয় তা অন্য বয়সে দেখা যায় না।তবে বাল্য প্রণয় কোন অভিসম্পাত আছে। প্রতাপ জানত শৈবলিনী জ্ঞাতি কন্যা।সুতরাং উভয়ের বিয়ে হবে না। কিন্তু একথা শৈবলিনী জ্ঞান হয়ে জানতে পারে। প্রতাপকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই একথা জেনেও সে উপলব্ধি করে প্রতাপ "ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই"।

ভাগীরথীর তীরে আম্রকাননে দুজনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসে।উভয়ের মধ্যে প্রণয় গাঢ় হয়।জলে সাঁতার দিতে দিতে তারা বহু দূরে গেলে প্রতাপ তাকে জানালো যে এই তাদের বিয়ে। সে জলে ডুবল।কিন্তু বালিকা বয়সের ভয় ও ভীতির জন্য জীবন প্রীতির কারণে শৈবলিনী কূলে ফিরে গেল।নিমজ্জিত প্রতাপকে নৌকা আরোহী

চন্দ্রশেখর উদ্ধার করলেন এবং শৈবলিনীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও তাকে বিবাহ করলেন।তিনি যেন সমাজ শক্তির প্রতীক রূপে প্রতাপ শৈবলিনীর অনুরাগকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।এই অভিযোগ আমরা শৈবলিনীর মুখে পরে শুনতে পাই। চন্দ্রশেখর কে সে বলে---"এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম--- ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?" প্রতাপ চন্দ্রশেখরকে অত্যন্ত ভক্তি করে।সুন্দরীকে সে বলেছে, তার সর্বস্ব চন্দ্রশেখর থেকে। কিন্তু সে রূপসীকে বিয়ে করেও শৈবলিনীকে ভুলতে পারেনি। তার হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ হয়নি।তাও চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীকে সুখী করবার জন্য নিজে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

তার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্খা।এই আত্মদানের মাধ্যমে তার হৃদয়ের বেদনা গভীর সুরে বেজে ওঠে।

প্রতাপ শৈবলিনীর জীবন অপরের প্রভাব নিরপেক্ষ হয়ে স্বপ্ন মাধুর্যে গড়ে উঠেছে।কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করার পরে উভয় জীবনে এসেছে সংকট। তারা জেনেছে তাদের মধ্যে বিবাহের সমাজের বাধা আছে। প্রতাপ এই বাধা মেনে নিল।কিন্তু শৈবলিনী অদম্য জীবনস্পৃহায় তাড়িত হয়ে সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চাইল। চন্দ্রশেখরের বিবাহিত স্ত্রী হয়েও প্রতাপকে পাওয়ার আকাঙ্খায় ঘর ছাড়লো।এর পরিণাম তার পক্ষে হল ভয়াবহ।কঠিন প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে সে অবশেষে উন্মাদ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে বেদ গ্রামে স্বামী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে পুনরায় ঘরে ফিরে গেল।

দেখা যায় মূল কাহিনী শৈবলিনী প্রতাপকে নিয়ে রচিত হলেও চন্দ্রশেখর কাহিনীর গতিকে ত্বরান্বিত করেছেন। তিনি পরিবর্তনশীল ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছেন। চন্দ্রশেখর ব্যতীত উপন্যাসের উত্থান পতন এবং পরিণতি সম্ভবপর ছিল না।

চন্দ্রশেখর যদি গঙ্গায় নিমজ্জিত প্রতাপকে উদ্ধার না করতেন,তবে শৈবলিনীর জীবনের সমস্যা দেখা দিত না। চন্দ্রশেখর যদি শৈবলিনী রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ না

করতেন,তবে প্রতাপ শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের জীবনের টানাপোড়েন উপস্থিত হতো না। তবে শুধু প্রতাপই নয়, শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের দাম্পত্য জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চন্দ্রশেখরের গ্রন্থপ্রীতিও। এর প্রমাণ পাওয়া যায় চন্দ্রশেখরের স্বগতোক্তিতে---

"হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি ?এ কুসুম রাজ মুকুটে শোভা পাইত। শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন?আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি,সন্দেহ নাই।কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ?...আমি তো সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত, আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি?...সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্য বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম।"

যৌবন অতিক্রান্ত চন্দ্রশেখরের মনে তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ সৃষ্টি হল।তিনি সুপুরুষ, জ্ঞানী, পরোপকারী, নিষ্কলঙ্ক,আদর্শ পুরুষ।তবে গুণাবলী তাঁর যতই থাক তিনি যদি প্রেমের উচ্ছ্বসিত ধারায় শৈবলিনী অন্তরকে প্লাবিত করতে পারতেন তবে শৈবলিনীর পক্ষে প্রতাপকে ভুলে যাওয়ার খানিক সম্ভাবনা ছিল।কিন্তু চন্দ্রশেখরের চরিত্রের কঠিন সংযম ও শাস্ত্র আলোচনার প্রতি অনুরাগ শৈবলিনীর অতৃপ্ত যৌবন কামনা দগ্ধ মনকে প্রতাপের অভিমুখী করেছে।শরৎচন্দ্র পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখরের আদর্শে রচনা করেছেন "গৃহদাহ"-এর মহিম চরিত্র এবং মধুসূদনের তারার প্রভাব দেখা যায় শৈবলিনী চরিত্রে। শৈবলিনীর মুখে আমরা যেন শুনতে পাই তারার ভাষা।

"দেহপদাশ্রয় আসি,- প্রেম উদাসিনী

আমি!যথা যাও যাব;করিব যা করো;-

বিকাইবো কায়মন :তব রাঙা পায়ে।।"

এর অনিবার্য পরিনাম হলো প্রতাপকে পাবার আশায় ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনীর গৃহত্যাগ ও প্রতাপের শৈবলিনী উদ্ধারের পরে আবার প্রতাপকে মুক্ত করার জন্য গঙ্গাবক্ষে উভয়ের সন্তরণ ও প্রতাপ কর্তৃক শৈবলিনীর কাছ থেকে তাকে ভুলে যাওয়ার কঠিন প্রতিশ্রুতি আদায়।প্রকৃতপক্ষে "আজি হইতে শৈবলিনী মরিল"। তারপর অরণ্য

সংকুল পার্বত্য দেশে শৈবলিনীর আশ্রয় গ্রহণ এবং অতি ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত পর্ব।রমানন্দ স্বামীর নির্দেশে চন্দ্রশেখরের দ্বারা তার প্রাণ রক্ষা ও পরিশেষে রোগমুক্ত হয়ে স্বামীর আশ্রয়লাভ।

উপন্যাসে এই কাহিনী প্রধান হলেও আরেকটি ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যায়িকা আছে। এটি হলো নবাব মীর কাসেম ও দলনী বেগমের কাহিনী। আপাতদৃষ্টিতে এই কাহিনীকে গৌণ বলে মনে হলেও এর স্বাতন্ত্র এবং সম্পূর্ণতা অনেক গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।ইতিহাসের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা বলে এটি মূল কাহিনীর মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে। ইতিহাসের আকর্ষণে যেমন মীরকাশেম ও দলনীর জীবন আলোড়িত হয়েছে,তেমনি শৈবলিনী প্রতাপ চন্দ্রশেখরের কাহিনী ইতিহাসের প্রবল আকর্ষণে ও পুরন্দরপুরের পরিধি অতিক্রম করে মুক্ত জীবন স্রোতের মধ্যে এসে মিশেছ। দুটি কাহিনী পরস্পরের পরিপূরক।এই কাহিনীতে আমরা চন্দ্রশেখরের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখতে পাই।তিনি ভাগ্যনিয়ন্তা শৈবলিনী ও দলনী বেগমের আখ্যায়িকাকে সংযুক্ত করেছেন।দলনী যেদিন নবাবের প্রতি গভীর প্রেমবশত ভ্রাতা গুর্গণের সঙ্গে তার গৃহে দেখা করেছিলেন এবং তাকে নবাবের কল্যাণের জন্য যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেছিলেন সেদিন ভাগ্য তাকে বঞ্চনা করেছিল।তিনি জানিয়েছিলেন তিনি ভ্রাতা হলেও তিনি তার পরম শত্রু। "এই রাজঅন্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম"। একদিকে বেগমের স্বামীর প্রতি প্রেম আধিক্য।অন্যদিকে গুর্গণ চরিত্রের কুটিলতা দলনীকে দুর্ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে।গুর্গণ আদেশ দেয় যেন দলনী নবাবের দুর্গে প্রবেশ করতে না পারে।দলনী আশ্রয়হীন হয়ে অন্ধকার রাতে রাজপথে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।ঠিক সেই সময় এক দীর্ঘকায় পুরুষ অসহায় দলনীকে আশ্বস্ত করে তাকে প্রতাপের গৃহে আশ্রয় দেন।তার মুখে সকল ঘটনা শুনে চন্দ্রশেখর ভাবলেন ভবিতব্য খন্ডন করা যায় ন। তার পরামর্শ অনুযায়ী দলনী নবাবের জন্য একটি পত্র লিখলেন।চন্দ্রশেখর এই পত্রের ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব নিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজগণ প্রতাপের গৃহ আক্রমণ করে এবং ফস্টরের বিবি ভেবে তাকে ও তার সহযোগীকে অপহরণ করে। তাদের দু'জনকেই ইংরেজদের নৌকায় আশ্রয় প্রদান করা

হয়।পরবর্তীকালে যখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে তখন দলনীকে গঙ্গার তীরে নামিয়ে দেয়।সেখানে কোন গ্রামের চিহ্ন নেই আছে।শুধু কল্লোলিনী নদীর প্রবাহ গাঢ় হতে থাকে।গভীর রাতে পুনরায় এক দীর্ঘকায় পুরুষ উদ্ধার করেন তাকে।চন্দ্রশেখর তাকে নবাবের কাছে না যেতে উপদেশ দেন।দলনী জানান দেন মঙ্গল অপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভালো।চন্দ্রশেখর ভাগ্য গণনা করতে পারেন। দুজনেই মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন।দলনী "পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল"। সুতরাং তার জীবনে চন্দ্রশেখরের করুণা ও সহানুভূতি কাল হয়ে দাঁড়ালো।তিনি তাকে তকির গৃহে পাঠালেন।তকি নবাবকে দলনী সম্পর্কে মিথ্যে প্রতিবেদন পাঠালেন।নবাব নির্দেশ দিলেন দলনী কে বিষ দিয়ে হত্যা করার জন্য।কিন্তু তকি দলনীকে জানালেন বিষপানে তাকে আত্মহনন করতে হবে না।তকির ভজনা করলে তাকে আর বিষ খেতে হবে না।কিন্তু নবাবের আদেশ বেগমের কাছে ছিল অবশ্য পালনীয়।তার আদেশে দলনী নিঃসংকোচে বিষ পান করলেন।

সুতরাং দেখা যায় যে দলনীর জীবনে চন্দ্রশেখরের প্রভাব তার পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। কিন্তু একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই চন্দ্রশেখর তার চরিত্রশক্তি ও কার্যের দ্বারা শৈবলিনী ও দলনীর জীবন কে,মূল কাহিনী ও উপকাহিনী কে এক সূত্রে বেঁধেছেন অর্থাৎ গোটা উপন্যাসের চালক শক্তি হয়েছেন চন্দ্রশেখর।সেই কারণেই চরিত্রের নামে ঔপন্যাসিক গ্রন্থের নামকরণ করেছেন এবং তা সম্পূর্ণরূপে সার্থকতা লাভ করেছে।

৩.২ দুই কাহিনীর ঐক্য স্থাপনে সার্থকতা

উপন্যাসে প্রধান কাহিনীর সঙ্গে গৌণকাহিনী ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সাধনের জন্য উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে থাকে।কিন্তু "চন্দ্রশেখর"-এ এক অসাধারণ স্বাতন্ত্র ও গৌরব পরিলক্ষিত হয়।দুটি কাহিনী যেন একে অপরের পরিপূরক। একটির আলোকে আরেকটি আলোকিত হয়।দুটি কাহিনী মিলিত হয়ে উপন্যাসের সামগ্রিক রূপ গড়ে তুলেছে।"রাজসিংহ" উপন্যাসে জেবউন্নিসা মোবারক ও দরিয়া বেগমের কাহিনী প্রধান কাহিনীর পরিপূরক অংশ নয়। এই উপকাহিনী মূল কাহিনীর উপরে গভীর কারুণ্য

বিস্তার করে ইতিহাস অংশকে তথ্যবহুলতা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে মানবিক সত্য করে তুলেছে।কিন্তু "চন্দ্রশেখর"- এ গৌণ কাহিনীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।মীরকাশেমের কাহিনী ইতিহাসবৃত্ত ত্যাগ করে শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখরের পারিবারিক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছ। ইতিহাসের প্রবাহ দুই আখ্যায়িকার মধ্যেই গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে এবং তাদের পরিণতির দিকে ধাবিত করেছে।

নবাব মীরকাশেমের শাসনকাল একদিকে ইংরেজদের ও অন্যদিকে ভাগ্যান্বেষী গুর্গণ খাঁ-র ক্ষমতা লাভের প্রয়াসে শেষ লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে।ইংরেজদের অভিপ্রায় হলো নবাবকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা।কিন্তু নবাব তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে চান ন। তিনি যদি প্রজার মঙ্গল সাধনা করতে পারেন তবে সেই রাজ্য রাজত্ব তিনি করবেন না।

তিনি ইংরেজদের নির্দেশে তাদের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রজাপীড়নে সম্মত নন। এদিকে সেনাপতির অভিপ্রায় হলো ইংরেজ শক্তিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করে তাদের উচ্ছেদসাধন,অবশেষে নবাবকে অপসারিত করে ক্ষমতা লাভ করা।রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে উপন্যাসের দুটি কাহিনী সংস্থাপিত হয়েছে। শৈবলিনী,প্রতাপ, চন্দ্রশেখরের পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক কাহিনীর সংযোগ পরোক্ষ মনে হলেও দ্রুত ও নিশ্চিত গতিতে তার প্রভাব রাজনীতির আবর্ত সংকুল বিক্ষোভের মধ্যে তাকে আকর্ষণ করে এনেছে। অন্যদিকে দলনী বেগম অজ্ঞাতসারে রাষ্ট্র নীতির মধ্যে পদক্ষেপ করে তাঁর ও নবাবের জীবনকে শোকাবহ পরিনামের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।উভয় কাহিনীতে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অনন্যসাধারণ মহিমা লাভ করেছে।দুটি কাহিনী বাইরের ঘটনাবলীর দ্বারা বহিরঙ্গ ঐক্য মাত্র লাভ না করে,আন্তরিকভাবে সমন্বিত হয়েছে।

শৈবলিনীর কাহিনী মূলত আত্মনিষ্ঠ।বাল্যকালে তার ও প্রতাপের মধ্যে যে প্রণয় বন্ধন গড়ে উঠেছিল বিবাহিত জীবনে শাস্ত্রজ্ঞ চন্দ্রশেখরের সাহচর্যে সেই প্রণয়ের কথা ভুলতে না পেরে প্রতাপ কে লাভ করবার জন্য সে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র

বর্ণনা করেছেন প্রতাপের "মহেন্দ্র নিন্দিত বীর কান্তি" তার মনের সৌন্দর্য তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে।শেষ পর্যন্ত তাকে পাবার আশায় সে ঘর ছাড়ে।তার জীবনে দুঃখকর পরিনামের সঙ্গে প্রতাপ-চন্দ্রশেখর জড়িয়ে পড়েছে।দুঃখের দাবদাহে তাদের অন্তর দগ্ধ হয়েছে। দলনীর কাহিনীও বড় দুঃখের। নবাবের প্রতি তাঁর প্রেমে ও তাঁর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হয়ে তিনি ভ্রাতা গুর্গণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পত্র তাঁকে প্রেরণ করে। কিন্তু তিনি আর দুর্গে ফিরতে পারেননি।উভয় নায়িকার গৃহত্যাগের মূলে আছে তাদের ভ্রান্তি অস্থির বিচার,বুদ্ধির অভাব।

'বিষবৃক্ষ'-এর বিভিন্ন আখ্যায়িকা অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একত্র করেছেন।উক্ত উপন্যাসের আখ্যান গঠন শিল্প সৃষ্টির পরিচয় দান করে। "চন্দ্রশেখর"-এ ও দুটি কাহিনীর সংযোজনা। এখানেও ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি কৌশলের নিপুণতা ফুটে উঠেছে।পরিচারিকা কুলসম মারফত গুর্গণের কাছে পত্র পাঠান দলনী। তাঁর এই কার্যে অস্থির চিত্তের পরিচয় থাকলেও আসলে তিনি নবাবের মঙ্গল চিন্তা করেই পত্র পাঠিয়ে ছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নবাবের অমঙ্গল হবে।তিনি রাজ্য ভ্রষ্ট হবেন বা প্রাণে নষ্ট হবেন।একথা নবাবের মুখে শুনে দলনী কোন কিছু না ভেবে গুর্গণের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রাত্রিবেলা তার গৃহে গেলেন,সঙ্গে ছিল কুলসম। তাঁর পাঠানো পত্রকে সূত্র করে বিধাতা "দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন"। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সূত্রের রচয়িতা হলেন চন্দ্রশেখর।

বাল্যের প্রেম শৈবলিনীর মনে দুর্জয় হয়ে উঠল।"চন্দ্রশেখর" যদি তাঁর শাস্ত্র চর্চা ও অধ্যয়ন স্পৃহা কমিয়ে শৈবলিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন তাতে হয়তো প্রতাপের প্রতি আকর্ষণ খানিকটা আলগা হত।অনাদৃত ও উপেক্ষিত যৌবনের দুঃসহ ভার তাকে চঞ্চল ও বিক্ষোভ করে তুলল।ফস্টর ডাকাতি করে তাকে অপহরণ করে।কিন্তু শৈবলিনীর মুখে শোনা গিয়েছে ডাকাতির পূর্বে ফস্টর লোক পাঠিয়েছিল। সুতরাং অপহরণের পশ্চাতে তার অনুমোদন ছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য হল প্রতাপ পক্ষী কে পিজরাবন্ধ করা। বাল্য প্রনয়ের অভিসম্পাত আছে নাহলে কালের ব্যবধানে দুজন দুজনকে ভুলে যেতে পারত। শৈবলিনীর প্রেম যে কত প্রবল তার প্রমান আমরা চন্দ্রশেখরের প্রতি

তার উক্তিতে জানতে পারি শৈবলিনী বলেছে---"এক বোঁটায় আমরা দুটি ফুল এক বন মধ্যে ফুটিয়াছিলাম। ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?"ফস্টরের সঙ্গে তার বসবাস করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে অকপটে উত্তর দেয় যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পায় এই ভরসায়।

শৈবলিনী অতৃপ্ত যৌবন কামনার সঙ্গে "পাষানী" নাটকের অহল্যা চরিত্রের সাদৃশ্য আমাদের মনকে সচকিত করে।

শৈবলিনী নিজেই তার জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে নিয়েছে।তার অপহরণের বৃত্তান্ত শুনে প্রতাপ কৌশলে তাকে উদ্ধার করেছে। কিন্তু রামচরণ তার প্রভুর কথা না শুনে শৈবলিনীকে প্রতাপের বাড়িতে স্থান দিয়েছে।শয্যাশায়ী শৈবলিনী কে দেখে প্রতাপ এড়িয়ে যেতে পারেনি। "অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মত্ত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল"।

এই বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করা যায় বাল্যপ্রণয়ের তীব্রতা শুধু শৈবলিনীকে নয় বিবাহিত প্রতাপের জীবনে আলোড়ন তুলেছিল।শৈবলিনীর অভিযোগ শুনে সেখান থেকে চলে যায়।শৈবলিনী তাকে মনের কথা অকপটে জানিয়েছে।সে প্রতাপের জন্য ঘর ছেড়েছে।সুতরাং শৈবলিনী পাপী এবং প্রতাপ পুণ্যবান। বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় চরিত্রের পরিচয় বিশেষণ গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্যদিকে আমিয়ট,জনসন, গলষ্টন প্রতাপের গৃহ আক্রমণ করে ও শৈবলিনী ভেবে দলনীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।শৈবলিনী নবাবের সাহায্য নিয়ে তার বুদ্ধির দ্বারা প্রতাপকে উদ্ধার করে এবং দুজনেই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সন্তরণ কৌশলে প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। এখানেই ঘটে যায় দুজনের জীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে চরম অগ্নিপরীক্ষা।প্রতাপ শৈবলিনীকে অতীতের প্রণয় সম্ভাষণ মূলক সম্ভাষণে বিচলিত করে তোলে।এরপর প্রতাপ তাকে কঠোর সংকল্প বাক্য উচ্চারণের কথা বলে। কিন্তু সেও স্বীকার করে যে এই সংসারে সেও দুঃখী।তার দুঃখ শৈবলিনী অপেক্ষা কম নয়। সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করবার পারে পুরাতন শৈবলিনী এর মৃত্যু হল এবং নতুন

শৈবলিনী উপন্যাসিকের অভিপ্রায় অনুযায়ী জন্ম লাভ করল। এই শৈবলিনী আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতা। কঠোর প্রায়শ্চিত্ত অন্তে তাকে আমরা বেদগ্রামে দেখতে পাই। রমানন্দ স্বামীর যোগবলে সে তখন চন্দ্রশেখরের প্রতি অনুগতা।কিন্তু দেখা যায় যে শৈবলিনী প্রতাপের যুদ্ধযাত্রার কালে প্রতাপকে বলেছে তার সঙ্গে এ জন্মে দেখা না করতে কারণ---"স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার ,কতদিন বশে থাকিবে জানি না।"

দলনী বেগম নবাবের মঙ্গল কামনায় তার বিনা অনুমতিতে দুর্গ থেকে ভ্রাতা গুর্গণ খাঁ-র কাছে উপস্থিত হলে গুর্গণ তার দুর্গ প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিয়েছে। পথে দলনীর পরিচয় পেয়ে তার দুঃখপূর্ণ কাহিনী শুনে চন্দ্রশেখর তাকে প্রতাপের গৃহে এনেছেন। এই গৃহ থেকে রাত্রিবেলা ইংরেজদের দম্ভ ও হঠকারিতার তার জন্য দলনী বেগমকে অপহরণ করা হয়। এরপরে আবার দলনী ইংরেজদের নৌকো থেকে ফস্টরের প্রশ্রয়ে তীরে অবতীর্ণ হন। তার ধারণা হয়েছিল পশ্চাতে নিজামের নৌকো আসছে। কিন্তু তিনি তীরে অবতীর্ণ হতেই বিপর্যয় তাকে চতুর দিক থেকে ঘিরে ধরলো। পুনর্বার রাত্রিবেলা চন্দ্রশেখর তাকে উদ্ধার করলেন। চন্দ্রশেখর দলনীর সুবিধার্থে নবাবের কাছে যেতে তাকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু দলনী যে কোনো ঝুঁকি নিয়েই নবাবের দেখা যেতে চাইছিলেন। তখন তকি খাঁর গৃহে দলনীকে চন্দ্রশেখর পাঠিয়ে দেন। তকি নবাবকে দলনী সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করে। সে জানায় বেগম খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে আমিয়টের উপপত্নী রূপে বসবাস করছেন। এই সংবাদ শুনে নবাব দলনীকে বিষপানে নির্দেশ দেন। নবাবের আদেশ পালন করতে তকির ভোগ-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে দলনী স্বেচ্ছায় বিষপানে মৃত্যু বরণ করলেন।

প্রতাপের গৃহে দুই আশ্রিতা শৈবলিনী ও দলনীর দুর্ভাগ্য বিড়ম্বিত ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য রূপে গড়ে উঠেছে। এই দুই নারীকে কেন্দ্র করেই কাহিনী দুটি অংশ গ্রথিত হয়েছে এক সূত্রে।

যে দলনীর কাহিনী আমরা পাঠ করি তিনি শুধু নবাব মহিষী নন ভাগ্য বিড়ম্বিতা এক নারী। তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণ হলো তাঁর নবাবের মঙ্গল চিন্তা। কিন্তু বিচারের অভাবে

তাঁর জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে। তাঁর কাহিনী আমাদের আর এক রাজমহিষীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি সীতারামের মহিষী রমা।

শৈবলিনী ও দলনী নিয়তি-তাড়িত হয়ে দুর্ভাগ্য কে বরণ করেছেন।তাদের জীবনের ইতিহাস আখ্যায়িকার দুটি অংশকে সার্থকভাবে এক করেছে।

৩.৩ আধুনিক উপন্যাসের সার্থকতা

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে বীরাঙ্গনা কাব্য থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূচনা। মধুসূদনের প্রেম পত্রিকায় চার জন নায়িকা প্রকৃতপক্ষে বীরঙ্গনা। কারণ তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। তারা প্রেমের ক্ষেত্রে অশংকিনী। ঋষি পত্নী তারা তাঁর সমাজ বিরোধী প্রেমের জন্য গভীর অনুতাপ প্রকাশ করলেও নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। তারার মত বিধবা শূর্পণখা,বারাঙ্গনা উর্বশী তাদের প্রেমের কাছে প্রণয় নিবেদন করেছে। আত্মনিবেদনের আন্তরিক সুর কুমারী রুক্মিণীর মধ্যে দেখা যায়। তবুও তারার পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ তিনি ঋষি পত্নী হয়েও পুত্র প্রতি সময়ের সঙ্গে মিলিত হতে চান। কিন্তু তিনি মিলনকে গোপন রাখতে চান। শৈবলিনী এর মত প্রেমিককে লাভের আশায় ঘর ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবেন নি। উপরন্তু উপন্যাসে হৃদয় যেমন সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত হয়েছে তারার মধ্যে তা ঘটেনি। এই ক্ষেত্রে শৈবলিনী আলাদা অনন্যসাধারণ ও আধুনিকতার অগ্রদূত। আধুনিক কালে প্রেমের রূপকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সতীত্ব ও নারীত্বের মধ্যে সতী ধর্ম অপেক্ষা নারীত্ব অগ্রাধিকার পেয়েছে। আধুনিক কালে ফ্রয়েড বিচিত্র রহস্য বিশ্লেষণ করে নরনারী প্রেম জীবনের উপরে এক নতুন আলোকপাত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে একদিকে আছে সমাজ সংহতি অন্যদিকে পুরুষ অথবা নারী অপ্রতিরোধ্য প্রেমের গভীর আকুতি। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ সংহতির ধারক হলেও ব্যক্তিজীবনকে অস্বীকার করতে পারেননি। শৈবলিনী নিষিদ্ধ প্রেম কে তিনি বারংবার নিন্দা করেছেন তাকে তিনি পাপিষ্ঠা তাপসী প্রবৃত্তি যুক্ত করেছেন। তার সমাজ সংস্কার বিরোধী মনোভাব ও আচরণ কে বিচার করেছেন। তবু নারী হৃদয়ের

অনিবার্য প্রকাশ কে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। শৈবলিনী আট বছর বয়সে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করেছে তবুও সে তার বাল্য-প্রণয়ী প্রতাপকে ভুলতে পারেনি। স্বাভাবিক পথে প্রতাপ কে পাওয়া যাবে না এই কথা ভেবে সে ফস্টারের সঙ্গে তাকে লাভ করবার জন্য গৃহ ত্যাগ করেছে। প্রতাপ তাকে উদ্ধার করেছে কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেয়নি। প্রতাপ বন্দী হলে শৈবলিনী তার কৌশলে ও চাতুর্যে তাকে মুক্ত করেছে। গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ কালে বাল্য প্রণয়ের স্মৃতি জেগে ওঠে। কিন্তু সে চন্দ্রশেখরের কথা ভেবে সমাজের কথা চিন্তা করে সইবো নিয়ে কাছ থেকে কঠিন সংকল্প বাক্য আদায় করে। তাকে প্রতাপের চিন্তা পর্যন্ত ভুলে যেতে হবে এই কঠিন প্রতিশ্রুতি শৈবলিনী কে দান করতে হয়।

প্রতাপের আকর্ষণে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। নবাব মীর কাশেমের কাছে সে পতিব্রতার সংস্কার ভুলে প্রথম স্ত্রী রূপে নিজের পরিচয় দেয়। প্রেমের জন্য তার এই সমাজ বিদ্রোহিনী মূর্তি আমাদের অবাক করে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কবি মন শৈবলিনীকে নিন্দা করলেও তাকে অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি তাঁর জীবনের ভ্রান্তি ও দুর্যোগ বৃত্তির আলোড়ন কে অনুধাবন করেছেন। বাল্যপ্রেমের অভিশাপ আছে এই অভিশপ্ত প্রেমের উৎকণ্ঠা ও আবেগ কে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যে প্রেমের মহিমা নারীসত্তা কি সতীত্ব আদর্শের ঊর্ধ্বলোকে প্রতিষ্টিত করে তাকে বঙ্কিমের শিল্পী মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর সামাজিক মনে কার্য কে সমর্থন না করায় তিনি শৈবলিনী মনোলোকের পরিবর্তনের জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করেছে। রমানন্দ স্বামীর যোগবলের প্রভাবে অপ্রকৃতিস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করলেও প্রতাপকে ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রাকালে প্রতাপ কে শৈবলিনী বলেছে যে সে---"জীবিত থাকতে তার সুখ নেই। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার। কতদিন ভালো থাকিবে জানিনা।এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না"। শৈবলিনীর আন্তরিক স্বীকৃতি শুনে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমাজ সংস্কার সত্বেও নারীর প্রেম কে ও তার ব্যক্তিজীবনকে পূর্ণ মূল্য দিয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন যে

তার এই প্রেম জীবনের মর্মমূলে বিরাজিত। সুতরাং নারী হৃদয়ের এই অপ্রতিরোধ্য হৃদয়বৃত্তি কে অস্বীকার করা যায় না। শৈবলিনী তাই আধুনিক নারী জীবনের প্রতিনিধিরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

সর্ব শাস্ত্র বিশারদ রমানন্দ স্বামী ও তার জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের পরিচয় সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে বলেছেন---- আমি এতকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যায়ন করিলাম, সর্ব্বপ্রকার মানুষের সহিত আলাপ করিলাম,কিন্তু এর সকল বৃথা।এ বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না। এ সমুদ্রে কি তল নাই"।

শৈবলিনী কে বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রায়শ্চিত্ত অন্তে চন্দ্রশেখরের গৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তার মন দ্বিধা মুক্ত নয়। শৈবলিনী মানসলোকে প্রায়শ্চিত্ত পর্ব ও রমানন্দ স্বামীর যোগ বল যে কোন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারিনি সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। প্রতাপের জীবন বিসর্জনে শৈবলিনী প্রলোভন মুক্ত হলেও তার মনে প্রতাপের প্রতিষ্ঠা চিরকালীন। প্রতাপের স্মৃতি তার মনে চিরজাগরুক থাকবে। বিনোদিনী বার সাবিত্রীর মত তার চিত্ত ত্যাগের আদর্শে সঞ্জীবিত নয়। তাই তার মনোলোকে প্রতাপের চির প্রতিষ্ঠা। প্রতাপের ভালোবাসা আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত। প্রেমিকের মঙ্গলের জন্য শৈবলিনী ও আত্মবিসর্জন করতে পারে। সেই পরিচয় আমরা গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ কালে তার মুখে শুনতে পেয়েছি। কিন্তু প্রেমের এক নির্বস্তক আদর্শের জন্য সে তার জীবন বিসর্জনে উৎসাহিত নয়। তার জীবনে নারীসত্তা জাগরণ তাকে আধুনিকতা অগ্রদূত রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩.৪ প্রায়শ্চিত্ত পর্বের ব্যর্থতা

"চন্দ্রশেখর"এর মূল কাহিনী শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখর কে নিয়ে গড়ে উঠেছে। বিবাহের আট বছর পরেও শৈবলিনী বাল্য প্রণয়ের কথা ভুলতে পারেনি। প্রতাপ কে সে বারবার পাওয়ার আশা করেছে। প্রেমিককে পাওয়ার কামনায় একজন বিদেশীর সঙ্গেও ঘর ছেড়েছে। তাকে বলপূর্বক ধরে আনা হয়নি। এসেছে নিজের ইচ্ছায়। কারন সে ভেবেছি এর ফলে তার সাথে প্রতাপের দেখা হতে পারে। একথা সে নিজে

চন্দ্রশেখর কে জানিয়েছে। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি। প্রতাপ শৈবলিনী কঠিন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে যে শৈবলিনী তার কথা ভুলে যাবে। শৈবলিনী কাছে এক অপরিসীম শূন্যতা,শুষ্ক ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। যে ভয় জ্বলন্ত জঙ্গল থেকে বনের জন্তুরা পালিয়ে যায় শৈবলিনী ও প্রতাপের সংসর্গ থেকে দূরে সুখ সৌন্দর্য প্রণয় পরিপূর্ণ সংসার থেকে পলায়ন করলেন। সংসারের কোনো কিছুতে তার আকাঙ্ক্ষা নেই, আসক্তি নেই ,আছে আত্ম বিদারণকারী বেদনা,পরিশেষে আত্মার অবসাদ যা মৃত্যুর সমান। মৃত্যু শৈবলিনীর একান্ত আকাঙ্ক্ষিত হলেও তার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে নরক ভীতি।জাগ্রত অবস্থায় এই ভয় তাকে অবসন্ন ভয়ার্ত করেছে,তাকে যন্ত্রণায় দগ্ধ করেছে।প্রতাপের প্রত্যাখ্যান তার মানসিক বেদনা কে আরও উগ্র করে তুলেছে।

প্রতাপ তার অনুসন্ধান করে এই ভয়ে দিনের বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকলো এবং অন্ধকার রাত্রিবেলা পর্বতারোহণ শুরু করলো। অন্ধকার শিলাখন্ড তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলো আবারো কন্টকে ভগ্ন শাখায় তার শরীর থেকে রক্ত পড়তে লাগলো স্বেচ্ছাকৃত প্রায়শ্চিত্ত শুরু হল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম থেকে শৈবলিনী কে বিচার করেছেন। যে মানদণ্ডে তিনি রোহিণীকে দেখেছেন সে কি নৈতিক দৃষ্টিতে আচার-আচরণ কেও বিচার করেছেন এবং তাকে বলেছেন পাপিষ্ঠা। আবার প্রতাপ এর চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন শৈবলিনী-কলুষতা আমার এই লেখনী পূণ্যময়ী হইবে"।

প্রতাপের আত্মসংযম পারিবারিক তথা সমাজ জীবনের মূল্যবোধের প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণাবলী মুগ্ধ করেছে। কিন্তু উভয় যে বাল্যপ্রনয়ের কথা ভুলতে পারেনি,প্রতাপের মনেও শৈবলিনীর চিন্তা সদাজাগ্রত, তার রূপ-যৌবনের মনকে প্রলুব্ধ করে এই দিক গুলি সহানুভূতির সঙ্গে না দেখে, বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বিচার করেছেন বিবাহিতা নারীর গৃহত্যাগের ঘটনা। তিনি সমাজ সংহতির দিক দেখেছেন।নারীর ব্যক্তি জীবনের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মন নিয়ে দৃষ্টিপাত করেননি। এই ক্ষেত্রে শিল্পী বঙ্কিমের মানুষের জীবনে দ্বিধা ও বৈপরীত্য আমাদের চোখে পড়ে। প্রতাপ এর ক্ষেত্রে তিনি ও উদার এবং তার ব্যক্তি স্বত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রতাপের চরিত্র পুণ্যময়,এই বিশ্বাস

বঙ্কিমচন্দ্রের মনে দৃঢ়। কিন্তু অপর দিকে নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরূপ।

শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। বিবাহিত নারী হয়ে সে গৃহত্যাগ করেছিল এবং সমাজ বিন্যাস কে আঘাত করেছিল। সুতরাং তাকে চন্দ্রশেখরের গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্ত যদি কঠোর অনুশাসনের রূপ ধরে বাইরে থেকে আরোপিত হয় তা হয়ে পড়ে বিচারের নামে দুঃসহ অবিচার। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন যে প্রতাপ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পরে শৈবলিনী স্বেচ্ছাক্রমে প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সুখময় সংসার এ প্রবেশ করবার কোন অধিকার তার ছিল না। সুন্দরী তাকে ভৎসনা করে বলেছিল যে অনেক পুণ্যফলে চন্দ্রশেখরের মত স্বামী সে পেয়েছিল। তার দেবতুল্য ভালোবাসা পেয়েছিল। কিন্তু সে পাপিষ্ঠা তাই তার মূল্য সে উপলব্ধি করতে। যাইহোক প্রতাপ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পরে শেষে প্রায়শ্চিত্ত প্রবৃত্ত হল। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী সমগ্র প্রায়শ্চিত্ত পর্বকে বিশদ রূপে উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। অতি বিস্তৃত এই বর্ণনা যে শিল্প সম্মত হয়নি তা মেনে নিতে হয়।তৃতীয় খন্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে এবং চতুর্থ খন্ডে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে দুটি পর্যায় আছে একটি হল শৈবলিনী স্বেচ্ছাকৃত প্রায়শ্চিত্ত এবং অন্যটি হলো রমানন্দ স্বামীর আরোপিত কঠোর কৃচ্ছ সাধনা ব্রত। উপন্যাসের দিক থেকে প্রথম পর্বের সার্থকতা আছে কিন্তু দ্বিতীয় পর্বটি শিল্পের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। মনে হয় এখানে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র কে বেশি আলোকিত করেছেন। পার্বত্য গুহায় শৈবলিনী এর অনশনে দুদিন কেটেছে তারপরই শুরু হয়েছে বিভীষিকা পূর্ণ নরক দর্শন। অস্পষ্ট আলোকে সে প্রত্যক্ষ করেছে রুদ্রের নদী গলিত শব স্রোতবাহী তো কঙ্কাল মালা এবং অস্থিময় কুম্ভীর প্রভৃতি। রমানন্দ স্বামীর কঠোর নির্দেশে তাকে রুদ্রের নদী সাঁতার দিয়ে পার হতে হলো। যখন সে পরপারে এল তখন সে দেখতে পেলো আলোক অত্যন্ত ক্ষীণ কিন্তু এত উত্তপ্ত যে শৈবলিনী চক্ষু বিদীর্ণ হতে লাগলো। এই নরক থেকে উদ্ধারের উপায় মহাপুরুষ জানালেন যে তাকে বারো

বছরের কঠিন ব্রত পালন করতে হবে। গ্রাম প্রান্তে পর্ণকুটির নির্মাণ করে তাকে মাটিতে শয়ন করতে হবে। ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু শেখাতে পারবে না এবং তাও দিনে রাতে একবার। তাকে জটা ধারণ করতে হবে এবং দিনের শেষে ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করে নিজের মুখে তার পাপের কথা সকলকে জানাতে হবে। যদি সপ্তাহকাল দিনরাত্রি সে একমাত্র স্বামীর ধ্যান করে অন্য চিন্তা মনে স্থান না দেয় তবে সে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাবে। শৈবলিনী এই ব্রত পালন করবার পরে চন্দ্রশেখরের পৌরুষদীপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হলো। চন্দ্রশেখরের কাছে প্রতাপের রূপ যেন নিন্দনীয়।তার মনে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা জেগে উঠলো।শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলে চন্দ্রশেখরকে ভালোবাসলো।

সপ্তম রাত্রে গুহায় সাবধান করতে করতে শৈবলিনী ভয়ঙ্কর নরক কে প্রত্যক্ষ করল তাকে গ্রাস করার জন্য সর্পসমূহ ফণা বিস্তার করে ছুটে এলো। চতুর্দিকে পর্বতাকার অগ্নি প্রজ্বলিত হল। শৈবলিনী অগ্নিশিখায় দগ্ধ হতে থাকলো। এক প্রকাণ্ড বাঘ তাকে মুখে করে তুলে নিয়ে পর্বতের দিকে এগিয়ে চলল। চন্দ্রশেখর এসে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। শৈবলিনী এই অভিজ্ঞতা লাভ করলো স্বপ্নের মধ্যে। রাত্রি শেষে সে দেখতে পেল তার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তার জ্ঞান আছে। অন্ধকারে শূন্যপথে পিশাচেরা তার কেশ আকর্ষণ করে উড়ে চলেছে। আকাশে জ্যোতির্ময়ী দেবী গনের জ্যোতি শৈবলিনী পাপ পূর্ণ দেহের সংস্পর্শে এসে নিভে যাচ্ছে। নক্ষত্র সুন্দরীগণ শৈবলিনী দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বলছে মনের মধ্যে তাড়নায় অসতী আছে। পিশাচেরা তার মস্তকে পদাঘাত করে তাকে নরকে নিক্ষেপ করল। শৈবলিনী তাকে রক্ষা করবার জন্য চন্দ্রশেখরের নিকট আকুল আহ্বান জানালো। সহসা শৈবলিনী মনে হলো যে সে মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে জীবন লাভ করেছে। চন্দ্রশেখরের বাহুবক্ষে সে শায়িতা। তাঁর চরণে সে তার মুখ ঘষতে থাকলো। চন্দ্রশেখরের বক্তব্যের উত্তরে সে জানালো যে সে ফস্টরের সঙ্গে স্বেচ্ছায় গৃহ ত্যাগ করেছিল। শৈবলিনী মনো নরক থেকে উদ্ধার পেতে চায়। জীবিত অবস্থায় সে ভয়াবহ নরক দর্শন করে ভীত, তার মানসিক বিকৃতি ঘটলো। সে যেন দেখতে পেল নরকের পিশাচেরা কর্নাটকের হাতে নিয়ে বৃশ্চিকের

বেত্র দিয়ে তাকে প্রহার করতে লাগলো। তাল বৃক্ষ পরিবৃত্ত সুন্দরী তাকে মারার জন্য উচ্চকণ্ঠে নির্দেশ দিতে লাগলো।।। সুন্দরী ও তার প্রতি কোনো বিপদ প্রদর্শন করল না। তাকে মারবার জন্য বারংবার বলতে লাগল। শৈবলিনী তখন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।তার মনে বিচ্ছিন্ন রূপে অতীতের অশুচি ঘটনাবলী এসে তখন ভিড় করেছে। সে বর্ণনা করেছে যে একদিন প্রতাপ নামে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল এবং শৈবলিনী রুপী ব্যাঙটিকে সে গিলে ফেলল। তার সব দুঃখের মূলে আছে ফস্টর। তাই তার কথা শৈবলিনী অবচেতন মনে বারবার জেগে উঠেছে। অনুতপ্ত শৈবলিনী চন্দ্রশেখর কে জিজ্ঞেস করেছে যে তিনি চন্দ্রশেখর কে চেনেন কিনা। তাকে জড়িয়ে ধরে সে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। চন্দ্রশেখরও কাঁদতে লাগলেন। সে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যেতে সম্মত হলো। চন্দ্রশেখরের পশ্চাতে উন্মাদিনী শৈবলিনী কখনো হাসতে হাসতে, কখনো কাঁদতে কাঁদতে,কখনো গান করতে করতে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলো।

জাগ্রত নরক দর্শন এর দুটি চিত্র আমরা দেখি। একটি সংক্ষিপ্ত ও অপরটি বর্ণনা পূর্ণ। এই দ্বিতীয় অংশে আছে সুন্দরীর চিত্র। সুন্দরী এখানে স্নেহময় নারী নয় সে তার পাপের কঠোর বিচারক। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী এর ব্যধিগ্রস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া দিকটি নতুন কৌশল অঙ্কন করে তার মনোজগতকে বিশ্লেষণ করেছেন। হতাশা অনশন মানসিক উত্তেজনা এবং অবসাদের ফলে তার জীবনে দেখা দিয়েছে উন্মত্ততা। সংসারের সঙ্গে সে সম্পর্কের কথা ভুলেছে। প্রতিটি ঘটনা বিশ্লিষ্ট ও বিকৃত হয়ে তাঁর মনোজগতে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। সে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। উন্মত্ততার মধ্যে এইযে আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ তার মনের স্বাভাবিকতার দিকটি ব্যক্ত করে এই কারণে চিত্রটি হয়ে ওঠে করুণ রসাশ্রয়ী।

একটি প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে দেখা দেয়।রমানন্দ স্বামী তাঁর তপস্যারত যোগ বল প্রয়োগ করে শৈবলিনী কে সুস্থ করেছেন এবং তাকে দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ ষষ্ঠ খন্ড অষ্টম পরিচ্ছেদে দেখা যায় অশ্বারোহণ যুদ্ধক্ষেত্র গামী প্রতাপ কে শৈবলিনী জানিয়েছে যে সে যেন তার জীবিত কালে শৈবলিনী সঙ্গে আর দেখা না

করে। "স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন বশে থাকিবে জানি না।" নিশ্চুপ প্রতাপ শৈবলিনী কথায় নীরবে অশ্রু বরণ করতে লাগলো। তারপরে সে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অর্থাৎ নিজের মৃত্যুর অভিমুখে যাত্রা করলো। রামানন্দ স্বামীকে তিনি তার শৈবলিনী প্রতি গভীর প্রেমের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে তার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।

সুতরাং মনে করা যায় যে রমানন্দ স্বামীর যোগবল শৈবলিনী জীবনী কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেনি। কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ছাড়াও শৈবলিনী এমন চন্দ্রশেখরের ভালোবাসা লাভের জন্য তার দিকে ধাবিত হতো। সুতরাং যোগবলের ফল জীবনে আংশিক মাত্র। তার মনের পরিবর্তনের জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রয়োজন ছিল না। শৈবলিনী জীবন থেকে অতীতের প্রেম বাসনা লুপ্ত হলেও তার বাসনা স্মৃতি জাগ্রত ছিল। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত ও যোগবলের দিকটি উপন্যাসে কাহিনী রূপায়ণে সার্থক হয়ে ওঠেনি।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১. চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নামকরণ সার্থক কিনা দু-একটি বাক্যে লেখ।

উত্তর-হ্যাঁ উপন্যাসটির নামকরণ চরিত্র কে কেন্দ্র করে সার্থক হয়েছে।চন্দ্রশেখর তার চরিত্রশক্তি ও কার্যের দ্বারা শৈবলিনী ও দলনীর জীবন কে,মূল কাহিনী ও উপকাহিনী কে এক সূত্রে বেঁধেছেন অর্থাৎ গোটা উপন্যাসের চালক শক্তি হয়েছেন চন্দ্রশেখর।সেই কারণেই চরিত্রের নামে ঔপন্যাসিক গ্রন্থের নামকরণ করেছেন এবং তা সম্পূর্ণরূপে সার্থকতা লাভ করেছে।

২. চন্দ্রশেখর উপন্যাসে কত ধরনের কাহিনী রয়েছে এবং কি কি?

উত্তর-চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দু'ধরনের কাহিনী রয়েছে। একটি মূল কাহিনী এবং অপরটি গৌণ কাহিনী।

৩. চন্দ্রশেখর উপন্যাস মূল কাহিনী নায়ক নায়িকা এবং গৌণ কাহিনীর নায়ক-নায়িকা কারা?

উত্তর-চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মূল কাহিনীর নায়ক নায়িকা হলেন চন্দ্রশেখর,প্রতাপ এবং শৈবলিনী।আর গৌণ কাহিনীর নায়ক নায়িকা হলেন দলনী বেগম ও মীর কাসেম।

৪. চন্দ্রশেখর উপন্যাসে কাকে কার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল?

উত্তর-চন্দ্রশেখর উপন্যাসে নায়িকা শৈবলিনী কে রমানন্দ স্বামীর দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

৩.৫ চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি প্রতাপ শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের জীবনের টানাপোড়েনের গল্প-ব্যাখ্যা করো।

২. চন্দ্রশেখর উপন্যাসটির নামকরণ কি সার্থক উপযুক্ত কারণ সহ লেখ।

৩. উপন্যাসে শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে কিভাবে নবজীবন লাভ করেছিল তা বর্ণনা করো।

৪. চন্দ্রশেখর উপন্যাস মূল কাহিনীর সঙ্গে গৌণ কাহিনী ঐক্য কি যথাযথ এবং কেন?

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা--- ভূদেব চৌধুরী।

২. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত---অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. "চন্দ্রশেখর" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলোচনা--- মিলন রায়।

৪. উনিশ শতক--- অলোক রায়।

৫. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা---- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস--- ড. সুকুমার সেন।

৭. 'চন্দ্রশেখর' আলোচনা--- বিদিশা সিনহা।

একক ৪ চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নিয়তির ভূমিকা ও অলৌকিকতার পরিচয়

বিন্যাসক্রম

৪.১ উপন্যাসের নিয়তির ভূমিকা ও অলৌকিকতার পরিচয়

৪.২ শৈবলিনী মৃত্যু ও নবজীবন লাভ

৪.৩ ট্রাজেডির আলোকে উপন্যাস

৪.৪ শৈবলিনীর দুর্ভাগ্যের কারণ

৪.৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উপন্যাসে নিয়তির ভূমিকা ও অলৌকিকতার পরিচয়

নিয়তির রহস্যময় কার্যকলাপের উপরে মানুষের নির্ভরতা বহু প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। গ্রীক নাটকে নিয়তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় প্রাচীন নাটকে ও কাব্যে নিয়তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। শেক্সপীরিয় নাটকে আমরা গৌণ এবং খল প্রকৃতির চরিত্রদের মুখে নিয়তির কথা শুনতে পাই। আবার জুলিয়াস সিজার নাটক নিয়তির ক্যাসিয়াস ভূমিকাকে আদৌ প্রাধান্য না দিয়ে মানুষের কার্যকলাপকে তাদের পরিণাম এর জন্য দায়ী করেছেন। অর্থাৎ মানুষই তার কৃতকর্মের দ্বারা ভাগ করে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের আমরা দলনী বেগমের ক্ষেত্রে নিয়তির নির্মম ভূমিকার পরিচয় পাই। তিনি সর্বদিক থেকে ভাগ্যবিড়ম্বিত। আমার মনে প্রশ্ন উঠেছিল "যে যাকে পায় তাকেই চায়না কেন! যাকে পায়না তাকে চায় কেন"। তিনি নিজেকে লতারূপে

কল্পনা করে শালবৃক্ষের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যাকে না পায় তাকে চায় কেন এই হল তাঁর প্রশ্ন। নবাব মীরকাসেমকে তিনি সত্যই মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন।কিন্তু তাঁর মুখে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা শুনে দুর্ভাগ্যের অপরিহার্য পরিণামের শঙ্কায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। নবাব তাকে বলেছেন যে ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদে তিনি রাজ্য ভ্রষ্ট হবেন হয়তো তাঁর প্রাণও যাবে। দুঃখে কাতর বেগম তাকে পরামর্শ দিলেন যুদ্ধে না যাওয়ার। নবাব কিঞ্চিৎ রুষ্ট হয়ে উত্তর দিলেন এব্যাপারে স্ত্রীলোকের পরামর্শ দেয়া উচিত নয় এবং নবাবের কর্তব্য হলো সেই পরামর্শে কর্ণপাত না করা। বিক্রমের অনুভূতি নবাব যে জ্যোতিষ শিক্ষা করেছিলেন বেগমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তিনি বিস্মিত হলেন এবং তাঁর জ্যোতিষ শিক্ষার গুরু চন্দ্রশেখরকে বেদগ্রাম থেকে আহ্বান করলেন। চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গননা করে রাজ কর্মচারীকে জানালেন তিনিও পারক। তিনি এই শাস্ত্রে অপারদর্শী।

উপন্যাসে দেখা যায় যে চন্দ্রশেখর দলনী বেগমের শুভকামনার জন্য যে কাজ করেছে তাদের জীবনে অশুভদায়ক হয়ে উঠেছে। বেগমের জীবনের পরিনাম পূর্ব নির্দিষ্ট পথে তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছে। চন্দ্রশেখরের কাছে এই পরিনাম পূর্ব থেকে জ্ঞাত। তুমি জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে তাঁর পরিণাম অবগত ছিলেন। দোলনের ভাগ্যে ঘটনাবলীর আবর্ত আলোড়িত হয়ে করুন পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়েছে। জ্যোতিষ গণনার ফলাফল দলনীর ক্ষেত্রে কি হবে তা জানা সত্বেও অদৃষ্টের উপরে নির্ভরতা কোন চরিত্রে দেখা যায় না। ঘটনাবলীর প্রবাহ দলনীকে পরিণামের দিকে আকর্ষণ করেছে। নবাব মীরকাসেম এবং অন্যদিকে রমানন্দ স্বামী এবং চন্দ্রশেখর তাঁর পরিণামকে প্রত্যক্ষ করেছেন মাত্র। সুতরাং ভাগ্য গণনা থেকে দোলনি বেগমের কাহিনী কে পৃথক করে দেখা যায়। তবে এই গণনা এমন এক রহস্যময় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের রচনা করা হয়েছে যে তা পাঠকের মনে গভীর কৌতুহল ঘনীভূত করে তোলে।

উপন্যাসে কয়েকটি স্থানে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম খন্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিচারে ভুল করে দলনী নবাবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ফস্টরের নৌকো

থেকে তীরে নেমেছেন। তিনি ভেবেছেন পশ্চাতে নিজামতের নৌকো আসছে। কিন্তু তাঁর ব্যাকুল আহ্বানেও সেই নৌকো ওখানে এলো না। দলনী নদীর অনতিদূরে প্রান্তরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। গভীর রাতে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ দলনীর কাছে উপস্থিত হলেন।সেই পুরুষের কথাবার্তা এবং ভবিতব্য সম্পর্কে নির্দেশ শুনলে মনে হয় তিনি চন্দ্রশেখর। আগন্তুক দলনীকে নবাবের কাছে যাবার বাসনা পরিত্যাগের কথা বললেন তিনি।কারণ তাতে অমঙ্গল হবে। কিন্তু দলনীর কাছে অন্যত্র মঙ্গল অপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভালো। তিনি তাঁকে তকি খাঁর গৃহে প্রেরণ করলেন। তকি তাঁকে মুঙ্গেরে পাঠিয়ে দেবেন। একথাও তিনি জানালেন যে মুঙ্গের দর্শন দলনীর হবে না। কেউ কেউ বলেন যে দূরের অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনা মন টের পায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে একথা সত্য তা নয়। তবে যাই হোক দলনীর বিষয়ে তকি খাঁর পত্র নিয়ে অশ্বারোহী যখন মুঙ্গেরে যাত্রা করল তখন দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হলো। সেই মুহূর্তে তাঁর পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ প্রথম কথা বললেন তাঁর কণ্ঠস্বরে অথবা আগত অমঙ্গল সূচনায় দলনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিচার বুদ্ধি আলোকে এই রহস্যময় সত্যতাকে মেনে না নিলেও আমাদের মনে হয় এরমধ্যে ভবিষ্যতের পূর্বাভাস আছে দলনীর জীবনে যা ঘটতে চলেছে তার সংকেত এখানে দ্যোতিত হয়েছে। দলনী সত্যি ভাগ্যহত রমণী। তবে একথা মেনে নিতে হয় অদৃষ্টবাদ এর আলোকে তার চরিত্র ও পরিণাম কে ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। দলনীর জীবনে যা ঘটেছে তার সকল প্রতিকূল অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। দলনী সত্যি নবাবকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু সাংসারিক অভিজ্ঞতা না থাকায় নবাবের আসন্ন অমঙ্গলের চিন্তায় বিচলিত হয়ে তিনি রাত্রিবেলা গুর্গন খাঁর সঙ্গে তাঁর দুর্গে দেখা করেন। তাঁর ধারণা হল ভ্রাতা গুর্গণ তাঁর অনুরোধে যুদ্ধ বন্ধ করবেন। কিন্তু তিনি গুর্গন খাঁর উচ্চাকাঙ্খার কোন পরিচয় জানতেন না। আর ধারণা ছিল নবাবের বিনা অনুমতিতে অভিযানের কথা না বলতে পারলেও তিনি গুর্গনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা জানিয়ে তাঁর রাগকে প্রশমিত করতে পারবেন। গুর্গনের কাছে ভগ্নির মঙ্গল আকাঙ্ক্ষার কোন

মূল্য নেই। তাই অনায়াসে সে রাত্রিবেলা দলনীর দুর্গ প্রবেশের পথ বন্ধ করে তাঁকে রাস্তায় এনে দাঁড় করাতে পারে। গুর্গন দলনীর জীবনের নির্মম নিয়তি রূপে কাজ করেছে।

নবাব হয়তো দলনীর অকপট স্বীকারোক্তি শুনে তাঁকে ক্ষমা করতেন। কিন্তু প্রতাপের গৃহ থেকে ফস্টরের বিবি ভুলে তাঁর অপহরণ তাঁর জীবনের করুণ পরিনামকে ত্বরান্বিত করল।অমঙ্গল তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করল।

দ্বিতীয়বারে দলনী স্থির বিচার বুদ্ধির পরিচয় না দিয়ে ভুল করলেন। তিনি যদি ফস্টরের নৌকায় থাকতেন তবে তাঁর জীবনের দুর্ভাগ্য এমন করে ঘটতো না। নিজামতের নৌকো ভেবে বিচার না করে তিনি একাই গঙ্গাতীরে নামলেন। চন্দ্রশেখর ব্যবস্থা করলেন দলনীকে তকি খাঁর গৃহে প্রেরণ করতে। কিন্তু তকি তার নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢাকবার জন্য নবাবের কাছে দলনদলনী সম্পর্কে একটা অসত্য প্রতিবেদন পাঠাল। তকির আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল বেগমকে নিজের ভোগ লালসা জন্য লাভ করা। দলনীকে সে চিনতে পারেনি।দলনী তার প্রস্তাবে রুষ্ট হয়ে পদাঘাত করলেন। কিন্তু স্বামীর আদর্শের কথা শুনে সহাস্যে বিষ পান করলেন। সতী নারীর জীবনে এক মধুর মর্মান্তিক অধ্যায়।

নিয়তির পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা খণ্ডন করা যায় না। কিন্তু নিয়তির কথা ভুলে গিয়েও আমরা ঘটনাধারার আলোকে দলনী বেগমের পরিণাম ব্যাখ্যা করতে পারি। দলনীর নিয়তি আমাদের মনকে বেদনায় মুহ্যমান করে বারবার মনে হয় সরলা, পতিভক্তিপরায়না এই নারী ঈশ্বরের কাছ থেকে সুবিচার পাননি। তিনি তাঁর কথা নবাবকে জানিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে কুলসমের বিবরণ থেকে নবাব তাঁর বেগমের কাহিনী অবগত হয়েছেন। দেসদিমোনার কাহিনীও ওথেলো জেনেছেন পরিচারিকা এমিলিয়ার কাছ থেকে। নবাব তাঁর জীবন দিয়ে দলনীর প্রতি তাঁর অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন ওথেলোও তাই করেছেন।

শৈবলিনীর ক্ষেত্রে নিয়তির কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।সে নিজে তার কার্য পরম্পরা অদৃষ্ট রচনা করেছে। অনুকূল পরিবেশ ঘটনাবলীকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। বিধিলিপি যে খন্ডন করা যায় না এর প্রমাণ আমরা "সীতারাম"এর শ্রীর জীবন থেকে উপলব্ধি করি। সেখানেও জ্যোতিষ গণনার ফলকে দূরে রেখে আমরা ঘটনাবলীর আলোকে শ্রী বা সীতারামের জীবন বিচার করতে পারি। গীতার তাৎপর্যের আলোকে সীতারামের জীবন ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই।

উপন্যাসে অতিপ্রাকৃতের উপস্থাপনা ঘটেছে যোগবলসিদ্ধ রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে। অপ্রকৃতিস্থা এবং পরে উন্মাদ রোগগ্রস্থা শৈবলিনীকে তিনি তাঁর কমন্ডলুর জল পান করিয়ে রোগমুক্ত করলেন। উপরন্তু তার যোগবল শৈবলিনীর মধ্যে সঞ্চারিত করায় শৈবলিনী প্রকৃতিস্থ হয়ে চন্দ্রশেখরের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

নবাবের দরবারে আমরা দেখি ফস্টর চন্দ্রশেখরের কোন প্রশ্নের উত্তর দিল না। শৈবলিনী সম্পর্কেও সে তার মনোভাব ব্যক্ত করল না। নবাব তকি খাঁকে কুকুরের দংশনে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। এরপরে ফস্টর রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক দৃষ্টির দ্বারা বশীভূত হলো। তিনি তাঁকে যে সকল প্রশ্ন করলেন তার যথাযথ উত্তর সে দিল। সুস্পষ্ট ভাবে জানালো যে সে শৈবলিনীর জার নয়।শৈবলিনী নিষ্পাপ।

অলৌকিকতার অবতারণা উপন্যাসের মধ্যে গভীর রহস্য সৃষ্টি করেছে।কিন্তু বাস্তব আশ্রয়ী উপন্যাস শিল্পের আলোকে তা সমর্থন যোগ্য নয়। শৈবলিনীর যোগবল প্রাপ্তি এবং রমানন্দ স্বামীর দৃষ্টিতে বশীভূত হয়ে ফস্টারের মানসিক অবসাদ উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য বিষয় নয়। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র যেন এই পরিণতির শিল্পসম্মত দিকটির দিকে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। তাই পরিনাম অংশটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই পরিনাম বাস্তবের সঙ্গে ক্ষীণভাবে সংলগ্ন একে কল্পনা সমৃদ্ধ রোমান্স হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

৪.২ শৈবলিনীর মৃত্যু এবং নবজীবন লাভ

শৈবলিনী ও প্রতাপের মধ্যে পারস্পরিক প্রণয় ও নির্ভরতা উভয়ের বাল্যকালে গড়ে উঠেছিল। তাদের বাল্যকালের অনুরাগের কাহিনী উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশে তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। ষোলো বছরের নায়ক প্রতাপ এবং চার বছরের নায়িকা শৈবলিনীর মধ্যে যে বন্ধন ঘটেছিল তা বাল্যকালেই সম্ভব। বার্ধক্যে বাল্য প্রনয়ের মধুর স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আর সবই বিলুপ্ত হয়। তাও ভাল প্রনয়ের কোন অভিসম্পাত আছে। কারণ এই প্রনয়ে বিবাহ সাধারণত পরিণতি লাভ করে না। আবার বাল্যকালের পুরনো প্রণয়নের বিবাহ যদি অন্যত্র হয় তবুও তারা তাদের বাল্যকালের অনুরাগের কথা ভুলতে পারেনা। সুতরাং বিবাহিত জীবন অবিমিশ্র মঙ্গলদায়ক হয়ে দেখা দেয় না। শৈবলিনী প্রতাপের দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি কন্যা। শৈবলিনী যদিও মনে করতেছে তাদের বিবাহ হবে কিন্তু প্রতাপ জানতো এই বিবাহ কখনো করতে পারে না। শৈবলিনী উপলব্ধি করেছিল সে প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে তার জীবনে কোন সুখ নেই। কিন্তু তাকে পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। দুজনে পরামর্শ করে গঙ্গায় সাতার দিতে লাগল। মাঝ নদীতে প্রতাপ শৈবলিনীকে জানালো---'এই আমাদের বিয়ে' ।শৈবলিনী উত্তর দিলো----'আর কেন--- এখানেই'। প্রতাপ ডুবলো কিন্তু শৈবলিনী তার মানসিক ভীতি আত্মসচেতনতার কারণে ডুবতে না পেরে ফিরে গেল। এই সময়ে নৌকারোহী চন্দ্রশেখর প্রতাপ কে উদ্ধার করলেন। বত্রিশ বছর পেরিয়ে গেলেও তিনি বিবাহ করেননি। কারণ তার জ্ঞান অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পরে তাকে বিবাহ করতে হলো। শৈবলিনী রূপ দর্শন করে সংযমের ভঙ্গ হলো। তিনি শৈবলিনী কে বিবাহ করলেন। বাল্য করেন আরেকটি অধ্যায় যদিও এখানে শেষ হল তবুও তার জীবনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। উভয়ে উভয়কে ভুলতে পারল না। তবে শৈবলিনী মধ্যে তার বিবাহিত জীবনেও পূর্ব পুরনো অভিলাষ যেমন তীব্র হয়ে দেখা দিল প্রতাপের জীবনে ততদূর তীব্র ও ব্যাপ্ত হতে পারেনি। তবুও সে শৈবলিনী কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। বঙ্গদর্শনে বর্ণিত হয়েছে যে শৈবলিনী 'মহেন্দ্রনিন্দিত বীরকান্তি শোভিত' বাল্যসখা প্রতাপকে দেখে

সৌন্দর্য তৃষ্ণায় পুড়তে লাগলো। তার মনোভাব বুঝতে পেরে প্রতাপ গ্রামে আসা বন্ধ করে দিল। তবু একথা সত্য প্রতাপ তার বাল্যের প্রণয়িনীকে ভুলে যেতে পারেনি। রূপসীর দাম্পত্য জীবনের বন্ধনও তাকে আসক্তিমুক্ত করতে পারেনি।

"ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা;

বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।

নয়নের সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।"

বাল্যকালের প্রণয় পর্বের পরে শৈবলিনী দাম্পত্যজীবনে আট বছর পেরিয়ে গিয়েছে। নিদ্রিতা শৈবলিনীকে দেখে শাস্ত্র চর্চায় ব্যস্ত চন্দ্রশেখরের মনের ভাবান্তর ঘটেছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে জীবনে কখনো সুখ ঘটেনি। এই রত্ন দরিদ্রের কুটিরে শোভা পায়। 'আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই'। তার শাস্ত্র পুস্তকসমূহ তুলে এবং নামিয়ে শৈবলিনীর সুখ কোথায়! "বিলাস-চাঞ্চল্য-শূণ্য,সুসুপ্তিসুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চোখে অশ্রু বহিল"। আবার শৈবলিনী জীবনেও অপ্রত্যাশিতভাবে একটি অন্য ঘটনা ঘটলো। ইংরেজ কুঠিয়াল পুষ্করিণীর ঘাটে শৈবলিনীর রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে সুমিষ্ট আলাপরত হল। ফস্টরের মনে লোভ দেখা দিল। তখনকার দিনের ইংরেজদের মধ্যে ধর্ম শব্দটি লুপ্ত হয়েছিল। এদিকে তাকে স্থানান্তরিত করা হলো কলকাতার একটি বিশেষ দায়িত্বশীল পদে। সে মনে মনে বলল " Now or Never"।ফস্টর চলে যাওয়ার পরে শৈবলিনী তার গৃহে ফিরে এলো। সে ভেবেছিল যে তার বিলম্বের জন্য চন্দ্রশেখর তাকে ভর্ৎসনা করবেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর তার কাহিনী শুনে মন্তব্য করলেন "আর আসিও না"। এই কথা বলে তিনি শাঙ্কর ভাষ্যে মনোযোগ দিল। বাস্তবিকপক্ষে বিংশতিবিংশতি বর্ষীয়া নারীর প্রৌঢ় চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে কোনো কিছু লাভ করা সম্ভব ছিল না যাতে তার সৌন্দর্য তৃষ্ণা মিটতে পারে। প্রৌঢ় তপস্বী ও যুবতী বধূর মধ্যে স্বভাবগত গভীর পার্থক্য বর্তমান। চন্দ্রশেখর সংগ্রামী পুরুষ তার পক্ষে যুবতীর মানসিক আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করা সম্ভব না।

ফস্টর পুরন্দরপুরের কুটির ত্যাগ করবার পূর্বে ডাকাতি করে শৈবলিনীকে অপহরণ করে। সেই সময় চন্দ্রশেখর নবাবের আদেশ প্রতিপালনের জন্য তার গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি ফিরে এসে শৈবলিনী অপহরণের বিবরণ শুনে তাঁর অধীত,অধ্যনীয়,শোণিত তুল্য প্রিয় গ্রন্থসমূহ ভস্মীভূত করে গৃহ ত্যাগ করলেন। তৃতীয় খন্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে শৈবলিনীর কৌশলে প্রতাপ ইংরেজদের নৌকো থেকে মুক্ত হলেন এবং উভয়ে সাঁতার দিয়ে বহুদূর এগিয়ে গেল। যদিও এই ঘটনাটি উভয়ের জীবনের এক মধুর মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে তবুও প্রতাপ শৈবলিনীর কাছ থেকে কঠোর শপথবাক্য আদায় করে নিল যে শৈবলিনী তার চিন্তা পর্যন্ত ভুলে যাবে। সেদিন থেকে তার সর্ব সুখে জলাঞ্জলি। "আজি হইতে শৈবলিনী মরিল"। এখানেই ঘটলো শৈবলিনী জীবনে আত্মিক মৃত্যু।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর নিশাকালে শৈবলিনী অলক্ষ্যে প্রতাপের ছিপ থেকে পলায়ন করল। জ্বলন্ত অরণ্য থেকে জন্তুরা যেমন করে পলায়ন করে শৈবলিনী ও তেমনি প্রতাপের সংস্পর্শ থেকে সংসারের সকল সুখ সৌন্দর্য প্রণয় থেকে পালিয়ে গেল। সে পর্বতের উপত্যকায় একা স্বেচ্ছায় সে কঠিন প্রায়শ্চিত্তের ব্রত গ্রহণ করলো। যে পাপে সে নিমগ্ন হয়েছিল দুঃখভোগ এর মধ্য দিয়ে সে তা স্খলন করতে চায়। প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। পর্বতের শিখর দেশ থেকে জলপ্রবাহ ভীষণ বেগে এসে তার উরুদেশ পর্যন্ত ডুবিয়ে দিলো। বৃষ্টি থামলে ঝড় থেমে গেল। কিন্তু অন্ধকার গাঢ়তর হল। তার স্মৃতি পথে উদিত হল বেদ গ্রামের পতিগৃহের কথা। সে বোধ করল আর সূর্যোদয় দেখতে পাবে না। একবার যদি সে বেদ গ্রামের সুখাগার দেখে মরতে পারতো তবে সেই মৃত্যু হতো আনন্দ জনক। অন্ধকারে শৈবলিনী অনুভব করল মনুষ্য দেবতা তাকে ক্রোড়ে নিয়ে চলেছে। শৈবলিনী নিশ্চিত হলো সে যেই হোক ফস্টর নয়। শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্ত পর্বে মানসিক প্রতিক্রিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন।এরপর শুরু হলো তার শারীরিক যন্ত্রণা ও জাগ্রত অবস্থায় নরক ভীতি। রুধিরের নদনদ, গলিত শব স্রোতবাহিত কঙ্কাল মালা, অস্থিময় কুম্ভীরসমূহ অন্ধকারে প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে উঠলো। মহাকায় পুরুষের আদেশে শৈবলিনীকে রুধিরের নদী সাঁতার দিয়ে পার হতে হলো।মহাকায় পুরুষ তার সঙ্গে

নদীর স্রোতের উপর দিয়ে পদব্রজে চললেন। তখন আলো অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু এত উত্তপ্ত যে শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হতে লাগলো। নাসিকায় পুতিগন্ধ প্রবেশ করা সে উন্মত্তের ন্যায় হয়ে উঠলো। নরক থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় নির্দিষ্ট হলো যে তাকে বারো বছর ব্যাপী ব্রত পালন করতে হবে, গ্রামে ফিরে গিয়ে কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হতে হবে, পাপের কথা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা গ্রহণের সময় জানাতে হবে। যদি সে সপ্তাহকাল দিবা রাত্রি গুহার মধ্যে একাকিনী বাস করে অনন্যমনা হয় স্বামীর ধ্যান করে তবে সে তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। কঠোর তপস্যার মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করায় শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলে চন্দ্রশেখরকে ভালোবাসলো। সপ্তম রাতে সে চেতনা হারালো। স্বপ্নের মধ্যে সে দেখতে পেল ভয়ঙ্কর নরক কে। সে দেখল এক প্রকাণ্ড বাঘ তাকে পর্বতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু চন্দ্রশেখর পুজোর পুষ্পপাত্র থেকে একটি পুষ্প নিক্ষেপ করায় বাঘটি প্রাণ হারায়। তার মুখ ফস্টরের মত। শৈবলিনী চন্দ্রশেখর কে ধ্যান করতে লাগল এবং তাকে রক্ষা করবার জন্য কাতর স্বরে প্রার্থনা জানালো। হঠাৎই দুরন্ত নরকের বিভীষিকা অন্তর্হিত হলো হলো। শৈবলিনী মনে হল যে এই মৃত্যু নয় জীবন। চেতনা প্রাপ্ত হয়ে দেখল সে চন্দ্রশেখরের অঙ্কে শয়ন করে আছে। সে তাঁকে নরক থেকে উদ্ধারের জন্য আকুল আবেদন জানাল। চোখ বন্ধ করলেও নরকের ভয়ঙ্কর দৃশ্য,অগ্নিগর্জন,উত্তাপ,সর্পরাজি কদর্য কীট বৃশ্চিকের বেত্রধারী পিশাচগণ তাকে ঘিরে ধরে সুন্দরীর আদেশে অসতী জ্ঞান করে নির্যাতন করে চলল। শৈবলিনী তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। সে বর্ণনা করল যে একটি ছেলে সাপ হয়ে মেয়েরুপী ব্যাঙটিকে গিলে ফেলল। রূপকের মাধ্যমে সে প্রতাপ ও তার নিজের বর্ণনা দিয়েছে।শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের পশ্চাতে কখনো হাসতে হাসতে,কখনো বা কাঁদতে কাঁদতে এবং কখনো বা গান করতে করতে চলল।

বেদগ্রামে মহাপুরুষের অলৌকিক যোগবলের কৃপায় শৈবলিনী আরোগ্য লাভ করল।সে তার সকল কাহিনী চন্দ্রশেখরকে জানালো।তার একমাত্র অপরাধ হলো যে সে মনে মনে প্রতাপকে আত্মসমর্পণ করেছিল।এজন্য সে মহা পাপিষ্ঠা। কিন্তু ফস্টর সম্বন্ধে কায়মনোবাক্যে সে নিষ্পাপ।

অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রাকালে প্রতাপ কে দেখে শৈবলিনী আহ্বান করে বলল সে যেন তার সঙ্গে কখনো আর সাক্ষাৎ না করে। সে তার জীবনের সব কথা তার আসক্তির কথা চন্দ্রশেখরকে জানাবে। প্রতাপ তাকে সুখী হবার জন্য আশীর্বাদ করল। সে উত্তর দিল---"আমি সুখী হইবো না।তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।" প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প।সে জীবিত থাকতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নেই। শৈবলিনীর প্রতি গভীর অনুরাগের কথা কিন্তু সে রমানন্দ স্বামীকে জানালো। কিন্তু ওই অনুরাগে মঙ্গল নেই বলে সে আত্মবিসর্জন দিয়েছে।

শৈবলিনী তার স্বামীর ক্ষমা প্রেম ও আশীর্বাদ লাভ করে নতুন জীবনে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছে। সে সুখী হতে পারবে কিনা এ প্রশ্ন পাঠকের মনকে শিল্পী বঙ্কিমের মতোই আলোড়িত করে। প্রতিশ্রুতি তার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তবুও জীবনের মাধুর্য স্বামীর সেবা এবং কর্তব্য পালন তাকে হয়তো শান্তি দেবে। মৃত্যুর মাধ্যমে সে নবজীবন লাভ করল। এই জীবনে স্থিতি আছে কিন্তু প্রেমের আনন্দ নেই।

৪.৩ ট্রাজেডির আলোকে উপন্যাস

প্রাচীন গ্রিসে ট্রাজেডি আবির্ভূত হয়েছিল। হোমারের মহাকাব্য এবং গ্রিক নাটকে ট্রাজেডির রস রূপের পরিচয় আমরা পাই। গ্রিস থেকে ট্রাজেডির ধারা ইংল্যান্ডে এসেছে। সেখানে শেক্সপীরিয় হস্তে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।

গ্রীক ট্র্যাজেডি তে দেখা যায় যে নায়ক নানা গুণসমৃদ্ধ, নৈতিক আদর্শে উজ্জ্বল, বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত যথাযোগ্য এবং তাঁর চরিত্র সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু তারঁ বিচারের ত্রুটি বা অজ্ঞতাপ্রসূত কোন কাজের জন্য তাঁর জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। চরিত্রের ত্রুটির ছিদ্রপথে তাঁর জীবনে নিয়তির নির্মমতা প্রকাশিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চরিত্রের সত্যকার কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু যদি তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বিশ্বনীতির প্রতিকূলে কোন কাজ করেন তবে তাঁকে চরম শাস্তি পেতে হয়।

রাজা অয়দিপাউস এর দৃষ্টান্ত।আবার হিপ্পোলিটাস নায়িকার প্রেমের আহবানে সাড়া না দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে দেবী ভেনাস কুপিত হয়ে তাঁকে কঠিন শাস্তি দেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশ্ব নীতি কে আঘাত করলে জীবনে দুর্যোগ নেমে আসে।

শেক্সপীরীয় নাটকে ক্রুর নিয়তির এই জাতীয় ভূমিকা নেই। সেখানে মূলত নায়ক চরিত্র তাঁর একদেশদর্শীতার ফলে নিয়তিকে সৃষ্টি করেন। যেমন অথেলো বা লিওর চরিত্র। তবে গ্রীক নাটকে নায়িকা বানায় যেমন নিয়তির নির্মমতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন,শেক্সপীরীয় নাটকে নায়ক বা নায়িকা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে জীবনের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করে যান।

চন্দ্রশেখর এ দলনী বেগমের ক্ষেত্রে আমরা গ্রীক নাটকে বর্ণিত নিয়তির পরিচয় পাই। তাঁর কৃতকর্মের ত্রুটি অপেক্ষা অন্ধ বহিঃশক্তির প্রভাব ও অপ্রতিরোধ্য সক্রিয়তা অনেক বেশি। যে সূত্র ধরে তার জীবনের অপরিমেয় দুর্ভাগ্য রচিত হয়েছে মানব জীবনের তা স্বাভাবিক বৃত্তি মাত্র। স্বামীর-প্রতি-স্ত্রীর-ভালোবাসা ও নির্ভরতা স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা স্ত্রীর বিচলিত মনোভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। দলনী বেগম ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের সম্ভাব্য সংঘর্ষ চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে সেই সংঘর্ষ বন্ধ করবার অভিপ্রায়ে তাঁর ভ্রাতা ও নবাবের সেনাপতি গুর্গণ খাঁর দুর্গে রাত্রিবেলা পরিচারিকা কুলসমকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু ভ্রাতার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। ভ্রাতা তাঁর ভগিনীর স্বামীর প্রতি গভীর আনুগত্য ও কর্তব্যবোধের কথা কল্পনা করেননি।গুর্গণ নবাবের দুর্গে দলনীর প্রবেশ করার পথ বন্ধ করে দেয়। এরপরে প্রতিকূল ঘটনার আবর্তে দলনী ভেসে যান।এই ঘটনার স্রোত নিবারণ করবার কোন উপায়ে তাঁর ছিল না। নিয়তির নির্দিষ্ট পথে তিনি শোকাবহ পরিণামের দিকে অগ্রসর হন। নবাবের অপর এক সেনানায়ক তকি খাঁর ষড়যন্ত্রে তারঁ জীবন নষ্ট হয়।নবাবের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি আত্মহত্যা করেন।এই করুণ ও মর্মঘাতী পরিনামে বিশ্বনীতির বিরুদ্ধে আমাদের মনকে প্রতিবাদ মুখর করে তোলে।আমরা অসহায় হয়ে দলনীর পরিনাম প্রত্যক্ষ করি।দলনী তার নিজের ভুলের জন্যই চরম দণ্ড লাভ করেছেন। তাঁর ত্রুটি হল নবাবের অনুমতি না নিয়ে রাত্রিবেলা ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।এছাড়াও

ফস্টরের বজরা থেকে পিছনে নিজামতের নৌকা আসছে ভেবে অন্ধকারে গঙ্গার তীরে একাকী অবতরণ।তখন তাঁর সঙ্গে কুলসম ছিল না।যে বিপর্যয়ে তিনি দুবার পড়লেন সেই দু'বারই তাকে উদ্ধার করলেন এবং আশ্রয় দিলেন চন্দ্রশেখর। কিন্তু চন্দ্রশেখরের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা তাঁর শোচনীয় পরিণামকে ত্বরান্বিত করেছে। নিয়তি তাঁর পরিণামের জন্য যেন আগে থেকেই পথ প্রস্তুত করে রেখেছিল।

সুতরাং দলনীর জীবনে আছে শুধু বাইরের শক্তির নির্মম প্রকাশ। তাঁর যে ত্রুটি তা আদৌ গুরুতর নয় তাঁর ত্রুটি সঙ্গে তাঁর জীবনের পরিণামের কোন সংগতি দেখা যায় না। দুঃখ যেন তাঁর বিধিলিপি। দলনীকে নিয়ে তাই ট্রাজেডির উত্তঙ্গ মহিমা রচিত হয়নি। অধ্যাপক নিকল মন্তব্য করেছেন যে "There is always something stern and majestic about the highest tragic art". এই কঠোরতা ও উত্তুঙ্গ মহিমার রূপ দলনী চরিত্রের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনায় দেখা যায় না।

শৈবলিনী ট্র্যাজেডি তার মানুষ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত। তিনি তার কার্যাবলীর ফলে নিয়তি কে সৃষ্টি করেছেন। তার অশান্ত প্রবৃত্তি দুর্দম প্রেম পিপাসা তার নিয়তি রূপে কাজ করছে। তার জীবনের পরিণাম সমাপ্তি লাভ করেনি। কিন্তু সে জীবনের স্বপ্ন ও মাধুর্য থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয়েছে। চন্দ্রশেখরের গৃহে পুনর্বার সেটা নিষ্পাপতা প্রমাণ এরপরে স্ত্রীরূপে গৃহীত হয়েছে কিন্তু প্রতাপের আত্মবিসর্জন এরপরে তার জীবনে আসা আনন্দ এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণ ভবিষ্যতের প্রদীপ চিরদিনের জন্যই নিভে গেছে। তাঁকে তাই মৃত্যুকল্প অবস্থায় বাকি জীবন যাপন করতে হবে। শুষ্ক মরুভূমি নিঃসঙ্গতা তার জীবনকে গ্রাস করেছে। মৃত্যুর ট্রাজেডির উপসংহার। এই মৃত্যুদণ্ড দ্বন্দ্বময় জীবনের শান্তিপূর্ণ অবসান। মৃত্যুর আশ্রয় দলনী বেগম লাভ করে শান্তির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু আনন্দহীন সৌন্দর্যহীন জীবনের নিষ্ফলতা শৈবলিনী কে বহন করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত পর্বে বর্ণিত নরক দর্শন বিভীষিকা তার জীবনে বাস্তব সত্যরূপে তার ব্যর্থ জীবন ধারনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

প্রতাপ কে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ পুরুষ রূপে অংকিত করেছেন। চন্দ্রশেখরের মঙ্গল কামনায় ও শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রতাপ তাঁর জীবনকে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে উৎসর্গ করলেও তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা প্রশমিত হতে পারেনি। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবেসেছিল। এই ভালোবাসা ছিল গভীর জীবন আলোড়ন কারী উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ প্রবাহের মতো। কিন্তু তিনি আদর্শের জন্য নিজেকে দমন করেছেন এবং অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তিকে কঠোর শাসনে সংযত রেখেছেন। তিনি তাঁর সমাজনীতি বিরোধী প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে চাননি। কিন্তু এই কঠিন শাসনে তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষপর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা রমানন্দ স্বামীর কাছে বলেছেন---"আমার মন কলুষিত হইয়াছে---- কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে?আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই এইজন্য মরিলাম।" মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর অশান্ত চিত্ত শান্তি লাভ করবে কিনা তা বলা কঠিন।নবাব মীরকাসেমের জীবনেও ট্রাজেডির রূপ লক্ষ করা যায়। তাঁর চরিত্রে একদিকে ইতিহাসের ধারা অন্যদিকে ব্যক্তি-জীবনের বেদনা ও নিষ্ফলতা এসে মিলিত হয়েছে। সেনাপতি গুর্গন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, তকি খাঁর প্রতিকূল আচরণ ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নবাবের পরাজয় প্রত্যেকটি ঘটনাবলী মিলিত হয়ে যেমন তাঁর শাসনকর্তা রূপে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার স্পৃহাকে ব্যাহত করেছে তেমনই তাঁর আসন্ন সিংহাসন চ্যুতিও রাজ্যের বিনষ্টি সূচিত করেছে। ঐতিহাসিক নায়কের পতন রাজ্যের প্রজাসাধারণের অমঙ্গল ত্বরান্বিত করে। ব্যক্তিজীবনেও তাঁর দুর্ভাগ্য দলনী বেগমকে হারিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। তকি খাঁর মিথ্যা প্রতিবেদনকে বিশ্বাস করে বেগমকে মৃত্যুদণ্ড দান করে তিনি তাঁর চরম দুর্ভাগ্য কে আহবান করে এনেছেন। দলনীর প্রেম ও আনুগত্য তাঁকে যে সাম্রাজ্যের অধিকারী করেছিল তা তিনি চিরকালের মতো হারালেন। এখানে নিয়তির বিড়ম্বনার পরিচয় পাওয়া যায়।

চন্দ্রশেখর আমরা পাঁচজন নর-নারীর ট্রাজেডির বেদনার পরিচয় পাই। ইতিহাসের মূলে আছে তাদের অচরিতার্থ প্রেম। প্রেম যেমন জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা আবার কখনো

জীবন বিনষ্টের কারণ। প্রেমের বেদনায় পল ভেরলেনের নায়ক বলেন যে নগরীতে বৃষ্টি হচ্ছে।আমার হৃদয়ও চলছে বর্ষণ। আমার হৃদয় বিদীর্ণ করেছে,এ কি অবসাদ।

"IL pleure dans mon coeur

Comme il pleut sur la villa

Quelle est cette langueur

Qui Pènètre mon coeur?"

চন্দ্রশেখরের প্রেম শান্ত, সংযত,অন্তর্মুখীন।শৈবলিনী সমাজবিরোধী প্রেমের তারণায় প্রতাপকে পাওয়ার আশায় বিদেশি ফস্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। প্রতাপের প্রেম বলিষ্ঠ,গভীর,কিন্তু আদর্শভিত্তিক। নবাব মীরকাসেমের প্রেম ও গভীর হৃদয় বিদীর্ণকারী, কিন্তু কর্তব্য কেন্দ্রিক। দলনীর প্রেম প্রেমাস্পদের মঙ্গলের জন্য সকল সুখ বিসর্জন দেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন। প্রেমিকের আদেশ তাঁর কাছে অবশ্যপালনীয়। "চন্দ্রশেখর"-এ বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের বিচিত্র রূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে গড়ে তুলেছেন। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন নারীর জীবনে হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব।এই অন্তর সংঘাতে রাজলক্ষী অচলা,কমললতা,রমা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।পুরুষের জীবনে প্রেম একটি বৃত্তি মাত্র। নারীর জীবনে দ্বন্দ্ব যত গভীর তার বেদনা তত।নারীর প্রেমই হলো জীবন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে নর-নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ না করে তাদের জীবনে প্রেমের আবির্ভাব পরিণামকে প্রদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কোথাও কোথাও ভবিতব্যের দিকটি মেনে নিয়েছেন।এর আলোকে আমরা দলনী,কুন্দনন্দিনী ও শ্রী-র ইতিহাস পাঠ করে বেদনাক্লিষ্ট হই।

ভারতীয় সাহিত্যে প্রেমকে মদনের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে। তাই রাজা দুষ্মন্ত কর্তৃক রাজ্যসভায় শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যের চরম অসম্মানের মধ্যে নাটকের সমাপ্তি হলেও ট্রাজেডির ব্যর্থতা ও কারুণ্য সূচিত করে। কিন্তু কালিদাস দেব অনুগ্রহে তাদের মিলন

সম্পন্ন করে নাটকের শিল্পসম্মত রূপ নয় উপাখ্যান কাব্যের বাঞ্ছিত পরিণতি দান করেছেন। এটি ট্রাজেডির অনুকূল নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ধারা অনুসরণ করেছে। দলনীর অনিবার্য মৃত্যু তাঁর ট্রাজিক পরিণাম সূচিত করেছে। শৈবলিনীর ক্ষেত্রে বিরাট প্রায়শ্চিত্তের শেষে তাকে আনা হয়েছে চন্দ্রশেখরের সংসারে। প্রতাপ তার প্রেমের আদর্শে এবং সবাইকে সুখী করার জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছে। শৈবলিনী জীবনে পরিনামে ব্যর্থ হয়েছে বিস্তীর্ণ মরুভূমির শুষ্কতা। নিষ্ফলতা ও নৈরাশ্য তার জীবনে একমাত্র পরিণাম সত্যরূপে দেখা দিয়েছে।

৪.৪ শৈবলিনীর দুর্ভাগ্যের কারণ

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নায়িকা শৈবলিনীকে নিয়ে মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে। তার জীবন দুর্ভাগ্যজনক পরিণতিতে শেষ হয়েছে। এজন্য তাকে একমাত্র দায়ী করা চলে না। তার জীবনে এসেছে দুজন পুরুষ যাদের আদর্শ ও জীবন দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। একজন হল প্রতাপ সে লাভ করেছে শৈবলিনীর প্রেম,তবুও সে নিষিদ্ধ প্রেমের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে জীবন বিসর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অন্যজন চন্দ্রশেখর নায়কোচিত মহিমা সম্পূর্ণ লাভ করতে না পারলেও ইন্দ্রিয় প্রাবল্য দমন করে সংযত,ধ্যানমগ্ন,তাঁর স্তব্ধ গভীর শান্ত মূর্তি আমাদের মুগ্ধ করে।

এই দুই পুরুষ দুটি ভিন্ন দিক থেকে শৈবলিনীকে আকর্ষণ করেছে। সে নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি। দুই বিপরীত আকর্ষণ তাকে বিচলিত করেছে। তবে সেটার মনোগত কামনা চরিতার্থ করার জন্য ঘর ছেড়েছে। এই ক্ষেত্রে সে আদৌ স্থির বিচার বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি। এই জাতীয় ভ্রান্ত পদক্ষেপ আমরা দলনীর জীবনে প্রত্যক্ষ করি। নবাবের দুর্গের বাইরে পা দিয়ে তিনি প্রতিকূল ঘটনা আবর্তের আলোড়নে ভেসে গিয়েছেন। শৈবলিনী অসম্ভবের আশায় প্রতাপ কে পাওয়ার দুর্নিবার আকর্ষণে ঘর ছেড়েছে। কিন্তু সেই ঘরে স্বামী চন্দ্রশেখরের গভীর সহানুভূতি ও মমতার জন্য পুনরায় ফিরে আসা সম্ভব হলেও সেই পুরাতন গৃহ পরিবেশ তাকে আত্মীয় রূপে অভ্যর্থনা করবার জন্য যেন আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

আপাতদৃষ্টিতে এ কথা মনে হতে পারে শৈবলিনী তার নিজের দুঃখ নিজে রচনা করেছে। একে বলা যায় নিয়তি। এটা তারই কার্যকলাপের ফল। তার সম্পর্কে এই মন্তব্য স্বাভাবিক বলে মনে হয় Character is destiny. তবুও শৈবলিনীর দুর্ভাগ্যের জন্য তার বিচারবিহীন দুর্গম প্রবৃত্তি একমাত্র দায়ী নয়। চন্দ্রশেখর প্রতাপ এবং পরম রহস্যময় প্রেমের দেবতার সুচতুর লীলা প্রত্যেকের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। চন্দ্রশেখর নানাগুণের অধিকারী তিনি সুপুরুষ শাস্ত্রজ্ঞ পরোপকারী এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। এক কথায় তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ তার মধ্যে প্রাকৃতজন সুলভ কোনো দুর্বলতা নেই। বত্রিশ বছর অতিক্রান্ত তখন তিনি শৈবলিনী কে বিয়ে করলেন। বিবাহ শাস্ত্র আলোচনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে তাই তিনি এতকাল বিবাহ করেননি। মায়ের মৃত্যুর পরে তার আর কোন উপায় ছিল না।তিনি স্থির করেছিলেন তিনি কোনো সুন্দরীকে বিবাহ করবেন না। কারণ যাতে মুক্ত হলে তার শাস্ত্র চর্চা ব্যাঘাত ঘটবে। কিন্তু "শৈবলিনী কে দেখিয়া সংযমের ব্রত ভঙ্গ হইল"। বিবাহের আট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।চন্দ্রশেখর আরো প্রৌঢ় হয়েছেন এবং শৈবলিনী বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী। নিদ্রায় অভিভূতা শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শন করে তাঁর মনে হল যেন "কুসুম রাশির উপরে কে যেন কুসুম রাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে"। এই বিলাস চাঞ্চল্য শূন্য সুন্দরী যুবতীকে দেখে চন্দ্রশেখরের মনে অনুশোচনা দেখা দিল। শাস্ত্র পাঠে তাঁর আনন্দ হতে পারে কিন্তু যুবতীকে এই সুকুমার কুসুমকে যৌবন তাপে দগ্ধ করবার জন্য কি তিনি বৃন্তচ্যুত করেছিলেন!বৃন্তচ্যুত কথাটি গভীর তাৎপর্যবহ। উপন্যাসের ষষ্ঠ খন্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা তাঁর কাছে শৈবলিনীর সুস্পষ্ট উক্তি শুনতে পাই। "এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল এক বনমধ্যে ফুটিয়ে ছিলাম---+ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?"। চন্দ্রশেখর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু তখন প্রতিবিধানের কোন উপায় ছিল না। শৈবলিনী অপহৃত হওয়ার পর তার উদ্ধারের জন্য ব্যগ্র সুন্দরীকে জানিয়েছে যে সে আর ঘরে ফিরে যাবে না। সুন্দরী যেন মনে করে সে মৃত। ঘরে না ফিরে যাওয়ার কারণ হল সে পুনর্বার সেই বৈচিত্র্যহীন জীবন ও সংযত হৃদয় ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখরের কাছে আর ফিরে যেতে চায় না। গৃহ জীবনের একান্ত শূন্যতা তাকে

অনিবার্যভাবে রূঢ় ভবিষ্যতের দিকে আকর্ষণ করেছে। ফার্স্ট ইয়ারের সঙ্গে সেই গৃহত্যাগ করেছে। সকলে জানে ইংরেজ কুটিয়াল তাকে অপহরণ করেছে। কিন্তু শৈবলিনী পরে চন্দ্রশেখরকে জানায় যে অপহরণে তার সম্মতি ছিল। ইন্দ্রিয় বিকারের জন্য সে রূপবান ফস্টরের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করেনি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রতাপরূপ পক্ষীকে ফাঁদে আবদ্ধ করা।

চন্দ্রশেখরের মনে শৈবলিনী প্রতি প্রেমের অভাব ছিল না।ফল্গু প্রবাহের ন্যায় অন্তরে প্রেমের ধারা প্রবাহিত ছিল। যেভাবে তিনি প্রায়শ্চিত্ত পর্বে শৈবলিনী কাছে থেকে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি দর্শন করে রমানন্দ স্বামীর কাছে অশ্রু বিসর্জন করেছেন এবং পরম স্নেহে পুনর্বার বেদগ্রামে তাকে গৃহে নিয়ে গিয়েছেন ও তাকে সুস্থ করবার জন্য প্রয়াস করেছেন এ থেকে শৈবলিনীর প্রতি তাঁর গভীর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাঁর স্বাভাবিক সংযম এবং শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রীতির জন্য কিছুটা অধিক বয়সের জন্য তার প্রেমকে উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রকাশিত হতে দেননি। গৃহদাহে রহিমের মত তার চরিত্রের এই সংসদ ও দৃঢ়তা দাম্পত্য জীবনের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করেছে। চন্দ্রশেখর যদি কিছুটা স্বামীর কর্তব্য পালন করতেন তবে হয়তো শৈবলিনী দুকূলপ্লাবী প্লাবনে ভেসে যেত না। তাঁর সংসার অনীহা এবং শৈবলিনী প্রতি তাঁর উদাসীনতা শৈবলিনী জীবনে যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছে তা সে ভরিয়ে তুলেছে প্রতাপের ধ্যানে। এই অবকাশ রচনার জন্য পরোক্ষভাবে চন্দ্রশেখর কে দায়ী করা যায়। যে প্রনয়ের প্রাবল্য শৈবলিনী প্রতি পার্বত্য গুহা এবং পরে বেদগ্রাম প্রদর্শন করেছেন তা যদি তিনি পূর্বে তাঁর আবেগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতেন তবে শৈবলিনী নিজেকে সংযত রাখতে পারতো এবং তাদের দাম্পত্য বন্ধন গড়ে উঠত।। সুতরাং চন্দ্রশেখরের নির্লিপ্ত মন গ্রন্থ প্রীতি ও সংসার বৈরাগ্য শৈবলিনীর জীবনে দুর্ভাগ্য রচনা করেছে।

অন্যদিকে প্রতাপ কে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলা চলে না। তার জীবনে বিচিত্র আকর্ষণ আছে। সে দস্যু ও জমিদার। নবাব কে সাহায্য করবার মূলে একটি বিষয় তাকে উৎসাহিত করেছে যে তার উপকার করতে পারলে সে হয়তো দু-একখানা বড় বড় পরগনা লাভ

করতে পারবে। "অতএব ইহা আমি করিব"। প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করেছিল কিন্তু এই বিবাহে সে সম্পূর্ণ সুখী হতে পেরেছিল কিনা তা বলা যায় না। তবে শৈবলিনী কে সে ভুলে যেতে পারেনি। দেখা যায় অবাধ জলে সন্তরন দৃশ্যে প্রতাপের "আনন্দ সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল"। প্রতাপ তাকে বাল্যকালের অনুরাগ মিশ্রিত নামে ডেকে উঠল। শৈবলিনী তার হৃদয়ের গভীর বেদনা ব্যক্ত করে বলল যে মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন। প্রতাপ উত্তর দিল যে সূর্য উঠেছে। এর তাৎপর্য হলো যে তাদের জীবন তখন বিপদ মুক্ত। তারা পরস্পরে সান্নিধ্য লাভে এখন সুখী। শৈবলিনী দুঃখের কথা শুনে সেও জানালো যে সে ও দুঃখী। সে ডুবে মরার প্রস্তাব দিল। শৈবলিনী তখন চিন্তা করল যে তার জন্য প্রতাপ মরবে কেন! কিন্তু এরপরে প্রতাপ শৈবলিনীর কাছ থেকে যে কঠিন সংকল্প বাক্য আদায় করল তা বাস্তবিকপক্ষে শৈবলিনী কাছে মৃত্যুতুল্য। প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্রে গেল আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষায়।এর মধ্য দিয়ে সে শৈবলিনীর প্রতি তার গভীর অনুরাগের কথা ভুলে যেতে চায়। শৈবলিনী ও তাকে জানিয়েছে যে যত দিন পর তার জীবিত থাকবে ততদিন যেন সে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে। "স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানিনা"। চন্দ্রশেখর যখন তাকে গ্রহণ করতে চান তখন অতীতকে ভুলে যাওয়া তার জন্য মঙ্গল। সুতরাং প্রতাপের বলিষ্ঠ,সংযত,জাগ্রত ও আদর্শনিষ্ঠ প্রেম শৈবলিনীর দুর্ভাগ্য মন্ডিত জীবনের পরিণতির জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী।

চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ উভয় নীতিবিদ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা লাভ করেছে। শিল্পী বঙ্কিম শৈবলিনীকে উপেক্ষা না করতে পারলেও তাকে পাপিষ্ঠা প্রভৃতি বিশেষণে কলঙ্কযুক্ত করেছেন। শৈবলিনী প্রতি ঔপন্যাসিকের এই অবিচার আমাদের রসবোধকে ক্ষুণ্ণ করে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১. চন্দ্রশেখর উপন্যাসে নবজীবন লাভ করেছিল কে?

উত্তর-চন্দ্রশেখর উপন্যাসে নবজীবন লাভ করেছিল নায়িকা শৈবলিনী।

২. চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি শৈবলিনীর নিয়তির জন্য কে দায়ী?

উত্তর- শৈবলিনীর ট্র্যাজেডি তার মানুষ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত। তিনি তার কার্যাবলীর ফলে নিয়তি কে সৃষ্টি করেছেন। তার অশান্ত প্রবৃত্তি দুর্দম প্রেম পিপাসা তার নিয়তি রূপে কাজ করেছে।

৪.৫ চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি ট্রাজেডি ধর্মী উপন্যাস ব্যাখ্যা করো।

২. চন্দ্রশেখর উপন্যাস দিতে শৈবলিনী দুর্ভাগ্যের জন্য আসলে দায়ী কে?-বিস্তারিত কারণসহ লেখ।

৩. উপন্যাসে নিয়তির ভূমিকা আলোচনা করো।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা--- ভূদেব চৌধুরী।

২. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত---অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. "চন্দ্রশেখর" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলোচনা--- মিলন রায়।

৪. উনিশ শতক--- অলোক রায়।

৫. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা---- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস--- ড. সুকুমার সেন।

৭. 'চন্দ্রশেখর' আলোচনা--- বিদিশা সিনহা।

একক ৫ ঘরে বাইরে- ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

বিন্যাসক্রম

৫.১ ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

৫.২ রচনাকাল

৫.৩ সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি

৫.৪ উপন্যাসের গঠনরীতি

৫.৫ উপন্যাসের সমাজনীতি

৫.৬ উপন্যাসের রাজনীতি প্রসঙ্গ

৫.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ প্রধানত রবীন্দ্র প্রভাবিত যুগ বলে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ কে বঙ্কিম যুগ বলে অভিহিত করা হলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কে রবীন্দ্র যুগ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্র প্রতিভার বিশালতা গল্প নাটক উপন্যাস আলোচনা করলেই বোঝা যায়। প্রতিটি রচনা এর মধ্যেই রয়েছে স্বাদ বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তি বৈচিত্র্য। বাংলা উপন্যাসের মোড় ফেরাতে এবং নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি যথার্থই বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী। মাত্র ষোল-সতের বছর বয়সেই ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর প্রথম উপন্যাস "করুণা" প্রকাশিত হয়(১৮৭৭-৭৮)। কিন্তু এই উপন্যাসটি ততটা

পরিপক্ক নয় বলে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। তারপরে প্রায় বাইশ বছর সময়ের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক উপন্যাস "বউ-ঠাকুরানীর হাট" প্রকাশিত হয়(১৮৮৩)। তারপর থেকেই তিনি ক্রমে উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং উপন্যাসিক শিল্পের উপর অধিকার অর্জন করলেন এবং বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়,বিচিত্র ঘটনা,বিচিত্র চরিত্রের সমন্বয় উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ঘরে বাইরে উপন্যাসটি তাঁর একটি সার্থক সৃষ্টি। বৃহত্তর সমস্যার ক্ষেত্রটিকে উপন্যাসে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

৫.২ রচনাকাল

ঘরে বাইরে উপন্যাসটি ১৩২২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৫ সালে "সবুজপত্র পত্রিকা"-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে সবুজপত্রে মুদ্রিত বহু অংশ বর্জিত হলেও পরবর্তী ১৯২০ সালে পরিবর্তিত সংস্করণে সে সমস্তই পুনরায় গৃহীত হয়। বর্তমানে মুদ্রণ উক্ত পরিবর্ধিত সংস্করণ এর পুনর্মুদ্রণ এবং সবুজপত্রের পাঠ এর সঙ্গে অভিন্ন।

৫.৩ সামাজিক ঐতিহাসিক পটভূমি

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অন্যতম নেতা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি ভারতীয় জীবনধারার সামগ্রিক উন্নয়ন কেবল বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল উত্তেজনা সৃষ্টি নয়। ব্রিটিশ অধীন ভারতবর্ষে ভারতের অধিকাংশ অত্যাচারিত মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে সাময়িকভাবে নানা বিদ্রোহ করে তুললেও জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে উঠেছিল। নানা মত নানা পথ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কংগ্রেসের পতাকার ছত্রছায়ায় গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল। এর ফলে প্রথম থেকেই কংগ্রেসের ভেতরে মতভেদ এবং বৈষম্য মাথাচাড়া দিচ্ছিল। বিংশ শতকে প্রথমার্ধেই কংগ্রেস এক জটিল সংকটের মুখে এসে দাঁড়ায় এবং কংগ্রেসের ঐক্য বিপন্ন হয়। দলের মধ্যে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুই মতবাদ এর পার্থক্য দেখা যায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। ১৯০৩-১৯০৫ এরমধ্যে রিসলে ও কার্জন বঙ্গভঙ্গের

পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন গোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গ কে সমর্থন করেনি। তবে শিক্ষিত উচ্চ বর্গ ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু উচ্চবর্গের মুসলিম সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিলেন। আবার কংগ্রেস নেতাদের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন নিম্নবর্গের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কি ভীত করে তুলেছিল। সে আন্দোলনের অস্ত্র বা পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় বয়কট বা বিদেশি দ্রব্য বর্জন। কিন্তু স্বল্প মূল্যের এবং পর্যাপ্ত বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে দামি ও অপর্যাপ্ত স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার ক্ষমতা নিম্নবর্গের হিন্দু বা মুসলিম কারোরই ছিল না। বিচার চাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গঠনমূলক স্বদেশী বা আত্মশক্তির বিকাশ এর মধ্য দিয়ে তিনি এই সমস্যার পথ দেখান। প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৫ শ্রাবণ সংখ্যায় 'সদুপায়' প্রবন্ধে স্বদেশী ও বয়কট সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন----

"জিজ্ঞাসা করি বাজারে আগুন লাগাইয়া অনেক সুখ লোকের মাথা ভাঙ্গিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশি কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণ কে কি সদস্যের বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না। দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না"।

জোরপূর্বক বিদেশি দ্রব্য বয়কট তিনি কোনদিনও চাননি পাশাপাশি স্বদেশী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তারা রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে ফেলেছিলেন। তাদের জনসংযোগের একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রচার। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কেও প্রতিবাদ জানান তাঁর "ব্যাধি ও প্রতিকার" (১৩১৪,প্রবাসী) প্রবন্ধে। তিনি বললেন----

"...যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধান হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ স্বজাতি স্বরাজ এর প্রতিষ্ঠা কোনদিনই হইবে না।মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম,প্রতিবেশীর

হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়... পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই।"

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা এবং বিরোধী মতাদর্শের প্রতিফলন দেখা যায় "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ১৯০৭-১৯১০, মূলত স্বদেশী আন্দোলন,বয়কটের পটভূমি। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে তুলনায় উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজ অপেক্ষাকৃত অধিক যোগদান করেছিল ঘরে বাইরে উপন্যাসে আলোচিত নিখিলেশের পরিবারটিও উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী মূলত তিন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস আলোকপাত করেছেন।

প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি নিখিলেশ।যার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের গঠনমূলক স্বদেশী বা আত্মশক্তি বিকাশের মতবাদ প্রকাশ করেছেন।দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সন্দীপ। শুধুমাত্র দেশপ্রেম নয় ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি মোহও সেই সময়ের দেশপ্রেমের আবেগকে ত্বরান্বিত করেছিল তা তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি বিমলা। উচ্চবিত্ত পরিবারের সাধারণ গৃহবধু। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলনেই প্রথম নারীরাও যোগ দিয়েছিল।হিন্দু নারীরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এই হিন্দু নারীদের প্রতিনিধি বিমলা।

"ঘরে বাইরে" উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র নিখিলেশ। নিখিলেশের চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাংলায় বয়কট স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।তিনি চেয়েছিলেন গঠনমূলক স্বদেশী যার দ্বারা সমাজের অশিক্ষিত শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে দেশাত্মবোধ উজ্জীবিত এবং পল্লীর উন্নয়ন সাধন উভয় কাজই সম্পন্ন হবে।"ঘরে বাইরে" উপন্যাসে তার এই ভাবনা নিখিলেশ এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসে প্রথম থেকেই দেখা যায় নিখিলেশ তার স্ত্রী বিমলা কে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চান। বাড়িতে ইংরেজি মেম দিয়ে তার শিক্ষা ব্যবস্থা করেছেন। তিনি চেয়েছেন বিমলা বাইরের বাস্তব জগতের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে তাদের ভালোবাসাকে যাচাই করে নিক। প্রতিদিন সকালে বিমলার দেবতা জ্ঞানে তাঁকে প্রণাম করার বিষয়টি তিনি মেনে নিতে পারেননি। উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করতেন তিনি। তাই সন্দীপদের মতের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। তিনি বলেছেন----

"দেশ জিনিসকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই---এত বড়ো জিনিসের সম্বন্ধে কোনো মন ভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই, লজ্জাওবোধ করি"।

স্বদেশী আন্দোলনে চরমপন্থীদের কার্যাবলী রবীন্দ্রনাথের একেবারেই পছন্দের ছিল না তা বোঝা যায় নিখিলেশের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে---- "কোনো একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে,উন্মত্তের মতো দেশের কাজে লাগবো না"।

দেশকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করে উঠলো জাতীয়তাবাদ ও কল্পনার আবেগে উত্তেজনায় তিনি রাজি নন। দেশের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দিলে বেশি হয়ে যায় অবহেলিত আর প্রধান হয়ে ওঠে বাহ্যিক আড়ম্বর। দেশ সম্পর্কে নিখিলেশের সুস্পষ্ট ধারণা আছে। দেশের ভালো-মন্দ শুভ-অশুভ সবকিছুকে নিয়েই সে দেশের সেবা করতে চায়। তাই সে বলে----- "দেশকে সাদাভাবে সত্য ভাবে দেশ বলেই জেনে,মানুষকে মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে,যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না,চিৎকার করে মা বলে;দেবী বলে মন্ত্র পড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি"।

অর্থাৎ তারা দেবী রূপে দেশের দেবীত্বের প্রতি আকৃষ্ট মোহগ্রস্ত,প্রকৃত দেশের প্রতি নয়।বিদেশি দ্রব্য বয়কট সম্পর্কে আন্দোলনকারীরাও জোরপূর্বক বিদেশি দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলে বস্তুর অপচয়ের ব্যাপারেও আপত্তি আছে। দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করা আসলে দেশের প্রতি অত্যাচার। সাধারণ মানুষদের নিয়েই দেশ।

সন্দীপদের দল যতই দেশকে দেবীজ্ঞানে পুজো করে ভিন্ন একটা ধারণা সৃষ্টি করুক আসলে নিখিলেশের কাছে দেশ হল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বাইরেও হাজার হাজার গরিব মানুষ, তাদের কল্যাণের মধ্য দিয়েই দেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব ।

চরমপন্থী স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম মাধ্যম ছিল সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রচার তারই প্রকাশ দেখা যায় সন্দীপ ও হরিশ কুন্ডুর দলের মহিষমর্দিনী পুজোর আয়োজনে। এই উপলক্ষে গরিব প্রজাদের থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা হয়েছে। এই আয়োজনকে নিখিলেশের মনে হয়েছে 'কুহক',প্রকৃত দেশ উদ্ধার না করে একটি নতুন 'কুহক' সৃষ্টি করে সকলকে হুজুগে মাতিয়ে রাখে সন্দীপ। নিখিলেশ চায় এর থেকে দেশকে উদ্ধার করতে অন্তরের যন্ত্রণা এসে বলে----"প্রমত্ততা থেকে দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি, তবে দেশের পূজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য দেশের কাজ বিমুখ ব্রম্ভাস্ত্রের মতো দেশের বুকে এসে বাজবে"।

নিখিলেশ আর এই আশংকা অমূলক নয়। কিছুদিনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেশকে জর্জরিত করে। শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুসলিম প্রজাদের আক্রমণের আশঙ্কায় সন্দীপের মতো নেতাদের এলাকা ছেড়ে পালাতে হয়,হরিশ কুন্ডুর কাছারি লুঠ হয়েছে,মেয়েদের ওপরও অত্যাচার শুরু হয়েছে। এই খবর শুনে নিখিলেশ বেরিয়ে গেছে। রাত দশটার পর যখন সে পালকি করে ফিরে এসেছে তখন তার মাথায় গুরুতর আঘাত। সন্দীপ এর মত কিছু সুবিধাবাদী ভন্ড দেশপ্রেমিক ভুল সিদ্ধান্তে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠেছিল তার থেকে দেশকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিখিলেশ এর মত আদর্শবাদীদের প্রাণ দিতে হয়েছে।

উপন্যাসে আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সন্দীপ।মূলত উপন্যাসটির ঘটনা আবর্তিত হয় সন্দীপকে কেন্দ্র করে। বিমলার প্রতি তার আকর্ষণ এবং নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্যজীবনে সন্দীপের প্রভাব শুধুমাত্র তাদের পারিবারিক জীবনে ছায়া ফেলেনি,সন্দীপের স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি নিখিলেশের জমিদারি প্রজাদের উপরও প্রভাব ফেলেছে।

সন্দীপের আত্মকথা অংশগুলোতে তার স্বগতোক্তি থেকে বোঝা যায় দেশপ্রেম ও স্বদেশী আন্দোলনের আবরণে সে বারবার নিজস্ব প্রবৃত্তিকে পূরণ করতে চেয়েছে। বিমলা যে তার মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়েছে তাও সে বুঝেছে। তাই আত্মকথনে সে বলেছেবলেছে---"আমার মক্ষীরাণী স্বপ্নের ঘোরেই চলেছে,সে জানে না কোন্ পথে চলেছে।সময় আসবার আগেই তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়"।

বন্ধু পত্নী সম্পর্কে একজন পুরুষের ধরনের মানসিকতা কখনোই একজন দেশপ্রেমিক স্বদেশীর হতে পারেনা।কিন্তু বন্ধু নিখিলেশ এর সঙ্গে দেশ সম্পর্কে যত মতপার্থক্য থাকো একটা সময় নিখিলেশের বন্ধুত্বের বন্ধনে তার বিবেক দংশন হয়। আবার বিমলাকে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতাও তার নেই। তাই সে চেয়েছে স্বদেশের সঙ্গে বিমলাকে মিশিয়ে দিতে। ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারে ভারতবর্ষ যেমন অবগুন্ঠনহীন হয়ে পড়েছে,বিমলাকেও সন্দীপ সেইভাবেই দেখতে চেয়েছে।

উপন্যাসে সন্দীপের আত্মকথন এই তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরেছেন। স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ ছিল চরমপন্থী নেতাদের বিলাসিতা। পোশাকে-আশাকে ,কথায় বার্তায়,চালচলনে আদব কায়দায় তাদের মধ্যে সবসময় সাবেহিয়ানা ফুটে উঠত। সন্দীপ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই চরমপন্থী নেতাদের উগ্র জাতীয়তাবাদ,হিন্দুত্ববাদ,অন্ধ আবেগ,বিলাস পূর্ণ জীবন যাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন।স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের আবেগ সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সন্দীপ যেমন নিজের মুনাফা লুটতে চেয়েছিল সেইরকমই হিন্দুত্ববাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল যা প্রকৃতই বাংলা স্বদেশী আন্দোলন সফল হওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দেশপ্রেম এর তুলনায় প্রতারণা তারমধ্যে অনেক বেশি ছিল তা বোঝা যায় অমূল্য সঙ্গে মতবিরোধে। যে মুহূর্তে বিমলার কাছে অমূল্য তার থেকে বেশি প্রাধান্য পেতে থাকে

সেই মুহূর্তেই অমূল্যর প্রতি সন্দীপের প্রতি হিংসা জেগে ওঠে। সে বিমলার কাছ থেকে টাকা আদায় করার পর তার সর্বস্ব গয়নাও দখল করতে চায়।কিন্তু সে কাজে অমূল্য বাধা দেওয়ায় সে রেগে যায়। নিখিলেশ ও বিমলার সামনে প্রকাশ্যে স্বীকার করে তার মোহের কথা----

"তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে---বন্দেমাতরং নয়,বন্দে প্রিয়াং বন্দে মোহিনীং,মা আমাদের রক্ষা করেন,প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন ----বড় সুন্দর এই বিনাশ"।

একদিকে সুপ্ত হয়ে থাকা দেশপ্রেম অন্যদিকে বিমলার প্রতি আকর্ষণ এই দুয়ের মানসিক দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত সন্দীপের দেশপ্রেম জিতে যায়। হয়তো কিছুটা বাধ্য হয়েই সে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস এরকম বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপন্যাসের মূল নারী চরিত্র বিমলা। স্বদেশী আন্দোলনের স্বদেশী ও বয়কট নীতি যে নিয়মের বাঁধ ভাঙ্গার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল বিমলার আর মত অন্তঃপুরবাসিনী নারীর অন্তরে তাই প্রশস্ত হয়ে বাঁধ ভেঙে ফেলেছে সন্দীপের উদাত্ত ভাষণ ও আকর্ষণ। শুধুমাত্র স্বদেশপ্রেমের আবেগ নয়,এর সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিগত প্রেমের মোহও। তার মনে হয়েছে -"আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি বাংলাদেশের বীর।যেমন আকাশে সূর্যের আবেগ তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারী চিত্রের অভিষেক যে চাই।নইলে তার যাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কি করে?"

বিমলার দেশপ্রেম আবর্তিত হতে শুরু করেছে শুধুমাত্র সন্দীপকে কেন্দ্র করেই। বন্দেমাতরম্ মন্ত্র সম্পর্কে এবং দেশকে দেবতা জ্ঞানে পূজা সম্পর্কে নিখিলেশ সন্দীপ তর্ক করলে বিমলা নিখিলেশের মতবাদকে মেনে নিতে পারেনি। বলেছে-

"আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলবো,দেবী বলবো, দুর্গা বলব-যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব।আমি মানুষ আমি দেবতা নই"।

শেষ পর্যন্ত তার সব মোহভঙ্গ হয়েছে। সন্দীপের আন্দোলনে ক্ষিপ্ত মুসলিমদের আঘাতে অমূল্য মৃত্যু ও নিখিলের মাথায় গুরুতর আঘাত যেন বিমলাকে প্রকৃত দেশপ্রেমের স্বরূপ বুঝিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশ এবং সন্দীপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতাদের মানসিকতা যেমন তুলে ধরেছেন সেরকমই বিমলা চরিত্রটিও সমসাময়িক নারীদের স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকাকে স্পষ্ট করে দেয়। উচ্চবিত্ত পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনীরা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে যোগ দিলেও সেই যোগদান সক্রিয় ছিল না।মূলত ধর্মীয় ভাবাবেগে,দেশকে দেবতা কেন পুজোর উদ্দেশ্যেই তারা তাদের সঞ্চিত অর্থ,গয়না তাদের দান করেছিল।কিন্তু দেশের জনসাধারণ সম্পর্কে, সাধারণ নারী সম্পর্কে কোন ধারণা এই নারীদের ছিলনা।

রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের প্রথম থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে চরমপন্থী নেতাদের উগ্রতা, সাধারণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্নতা--এসবের সঙ্গে তিনি আর আপোষ করতে পারেননি।সমগ্র উপন্যাসটিতে তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতা ও মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন।

৫.৪ উপন্যাসের গঠনরীতি

'গোরা' রচনার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণ যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তারই একটি বিশিষ্ট পর্যায় "ঘরে-বাইরে"-তে লক্ষ্য করা যায়। 'গোরা' পর্যন্ত কাহিনীর বক্তা লেখক নিজেই। "চতুরঙ্গ" তে লেখক কাহিনী বর্ণনার দায়িত্ব দিয়েছেন উপন্যাসের চরিত্রের উপর। আর "ঘরে-বাইরে" তিনটি চরিত্রের আত্মকথার সমন্বয়ে রচিত।এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসে এই রীতি ব্যবহার করেন। অবশ্য এই রীতিটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্য থেকে।একথা তিনি উপন্যাসের

বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতির কিছু কিছু সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই রীতির বেশ কিছু অসুবিধাও আছে। আমাদের আলোচ্য "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে এই নীতির প্রয়োগ সফল।

এই রীতির দুটি সুবিধার কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি, এই প্রথার গুণ এই যে "যে কথা যাহার মুখে শুনতে ভালো লাগে সে কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়"। দ্বিতীয়ত,বহু অনৈতিক বা অপ্রাকৃত বিষয়ের জন্য লেখকদের দায়ী হতে হয়না। কিন্তু 'রজনী' উপন্যাসে লেখক চরিত্রকে কথক রূপে গ্রহণ করেও শুধু আত্মভাবনাকে প্রকাশ করেননি, বহিঃসচেতনতাকে প্রকাশ করেছেন। যেমন প্রথম খন্ডের শেষে রজনীকে বলতে শোনা যায় "এই যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করেনা। আরেকজন বলিবে"। সুতরাং চরিত্রের মধ্যে লেখক এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আত্মকথন রীতিতে এই বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন জরুরি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না।

এই রীতির আরেকটি বড় সুবিধা হলো এতে কাহিনী বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে বর্ণিত হওয়ায় ভাষা,বিশ্লেষণ ভঙ্গি, বর্ননার রীতি ইত্যাদি ব্যক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন হওয়া উচিত। না হলে বর্ণনার সজীবতা ক্ষুন্ন হয় এবং চরিত্রের স্বকীয়তা নষ্ট হয়। এছাড়া চরিত্র বিশ্লেষণ এর ক্ষেত্রেও চরিত্রের স্বাতন্ত্র বা স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে হয়। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের সাফল্য সে দিক থেকে কম নয়। নিখিলেশ,সন্দীপ এবং বিমলার আত্মকথা নিখিলেশের অন্তর্মুখীনতা ও বেদনাবিদ্ধ হৃদয়,সন্দীপের আসক্তি ও আত্মসর্বস্বতা, বিমলার আবেগ ও অন্তর্বিক্ষোভ ও নারীস্বভাবের বিশিষ্টতাটুকু----তাদের আত্মকথার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। প্রত্যেকেই তার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে এবং কাহিনী বিশ্লেষণ করেছে।

এই রীতির পরবর্তী অসুবিধা হলো ঘটনা বর্ণনায় পুনরুক্তি,ফলে একঘেয়েমীর সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে অনেক সময়ই মূল ঘটনা এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বক্তার বিশ্লেষণ বৈচিত্র্যে আস্বাদনের নবীনতা বজায় আছে। অবশ্য পুনরুক্তি

ত্রুটি ‘ঘরে বাইরে’ তেও সর্বদা পরিহার করা সম্ভব হয়নি। যেমন কাহিনীর শেষ দিকে অনুতপ্ত বিমলা যে নিখিলের পা বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে---এই ঘটনা বিমলা এবং নিখিলেশের আত্মকথায় ব্যক্ত হয়েছে। এমন ঘটনা আরও রয়েছে। কাহিনীর স্থূল বিচারে এগুলি পুনরুক্তি এবং এমন পুনরুক্তি এই রীতিতে বোধহয় অপরিহার্য। তবে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্ত হওয়ায় পুনরুক্তি ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের ভিন্নতাকে প্রকাশ করেছে।

আত্মকথনরীতির আর এক অসুবিধা হল,বক্তা তার নিজের অন্তরতম অনুভূতির সার্থক অভিব্যক্তি দিতে সমর্থ হলেও এই রীতিতে বক্তার ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিচার বেশ অসুবিধাজনক। কারণ নিজেকে মানুষ ঠিক ভাবে বিচার করতে পারেনা। তবে "ঘরে বাইরে" তে একাধিক বক্তা থাকার কারণে বক্তার নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ যেমন উপস্থিত হয়েছে,তেমনি অপরের সম্পর্কে ভাবনাও ব্যক্ত হয়েছে। কাল সঙ্গতিবোধের অভাব এই রীতির অপর অসুবিধে,অর্থাৎ কখন কাহিনী উক্ত হয়েছে। ঘটনা শেষ হবার পর যদি কাহিনী বর্ণিত হয় তবে বর্ণনার মধ্যে নাটকীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে,আবার কাহিনী ঘটনার সমকালে বর্ণিত হলে একটি বিশেষ কাল সীমায় জ্ঞান সীমিত থাকায় বর্ণনার মধ্যে খন্ডতাবোধ বিস্তৃত হতে পারে। লেখক এই সমস্যার সমাধান করেছেন বক্তাদের মধ্যে একজনকে ভবিষ্যৎ সচেতন, অন্য দুজনকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে। বিমলা ঘটনা শেষ হবার পরে কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করেছে আর নিখিলেশ সন্দীপ কাহিনীর সমকালে আত্মকথা লিপিবদ্ধ করেছে। তবে বিমলার প্রথম আত্মকথায় কালসীমার ব্যবধান অনেকখানি। এই অংশে সমগ্র কাহিনীর ভূমিকা রচনা করা হয়েছে। তবে এরপর এই বিমলা ঘটনার সমকালে নিজেকে স্থাপন করেছে। এছাড়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে আত্মকথাগুলিকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে এগুলিকে উপন্যাসের এক একটি অধ্যায় বলে গণ্য করতে অসুবিধা হয় না। বিমলার মোহ,মোহের প্রবণতা, অবশেষে মোহভঙ্গ ও দাম্পত্যজীবনে কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন----রচনা ধারার প্রতিটি স্তর সুস্পষ্ট। এর মধ্য দিয়ে রাজবাড়ির অন্তঃপুরেরও একটা বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে এই উপন্যাসটিতে কেন লেখক নতুন রীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নিছক বৈচিত্র্য সৃষ্টি লেখকের অভিপ্রেত হতে পারেন না। কারণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকাশভঙ্গির অন্তরঙ্গ যোগে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বিশ্বাসী। একদিকে দাম্পত্য প্রেম অন্যদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শ এই দুই তত্ত্বের প্রকাশ এবং প্রত্যেকটি চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ যদি লেখকের লেখনিতে প্রকাশ পেত তবে তার মধ্যে একঘেয়েমি সম্ভাবনা দেখা দিতে পারতো। প্রত্যেকটি পাত্র-পাত্রী নিজস্ব রীতিতে তার মতবাদ ব্যক্ত করেছে, তার অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। এখানে উপন্যাসের মধ্যে একপ্রকার সজীবতা সঞ্চারিত হয়েছে। মনে হয় এই দিকে দৃষ্টি রেখে লেখক এই নতুন রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে তথ্য প্রদান ও তর্ক বিতর্ক মূলক "গোরা" উপন্যাস কেন এই রীতি অবলম্বন করে লিখেননি তিনি। 'গোরা'-র সঙ্গে 'ঘরে-বাইরে'-র পার্থক্য দুটি। প্রথমত,'গোরা'-র মধ্যে হৃদয়বৃত্তির যে দিকটি আছে সমস্যা হিসেবে তা ততো জটিল নয়,হৃদয়ের মর্মমূল ধরে তা জোরে নাড়া দেয় না। দ্বিতীয়ত, গোরা উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি। সত্য উপলব্ধি তার জীবনেই ঘটেছে। সুতরাং বক্তব্য উপস্থিত করবার দায়িত্ব সেখানে মূলত একজন সম্পর্ক।"ঘরে-বাইরে"-তে তিনজনেরই প্রায় সমান প্রাধান্য। সুতরাং সে দায়িত্ব লেখক একা বহন না করে পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। এছাড়া বলা যায় যে অন্তর্মুখী বিশ্লেষণ গভীরতা 'ঘরে বাইরে'-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য।আত্মকথন রীতিতেই তার পথ সুগম হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য এই উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন।

৫.৫ উপন্যাসের সমাজনীতি

"ঘরে বাইরে" উপন্যাসে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশী রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক আদর্শে নিখিলেশ ও সন্দীপের অবস্থান ভিন্নধর্মী। বহির্জগতের ক্ষেত্রে যেখানে জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্যকে অনুসরণে উদারপন্থী সেখানে সন্দীপ এবং নিখিলেশ পাশ্চাত্য অনুসরণকারী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী । সন্দীপ শুধুমাত্র বক্তৃতার সময় এবং অনেক সময় লোক দেখানো স্বদেশী কথা বলে বিদেশি দ্রব্য পোড়ায় কিন্তু স্পষ্টতই ব্যবহারিক সমস্ত ক্ষেত্রে সে বিদেশি জিনিস ব্যবহারের পক্ষপাতী। শুধু তাই নয় সে

দেশি জিনিস সম্পর্কে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। ব্যবহারিক জীবনে তার ভন্ডামি নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু যে স্বদেশী আন্দোলন ঘর বা নিজের গভীর জীবনদর্শন কে দেশীয় ঐতিহ্যের কাঠামো গড়ে তুলতে চায় সেখানে সন্দীপ কেবলমাত্র দেশমাতৃকার মূর্তি কল্পনা এবং বন্দেমাতারাম মন্ত্রের প্রয়োগ ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই স্বদেশীর পরিচয় দেয়নি। এমনকি দেশমাতৃকা এবং বন্দেমাতরম মন্ত্রটি কোন সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেনি সে,বরং ভাবনাগুলিকে দেশের অশিক্ষিত জনগণকে স্বদেশী উন্মাদনায় উন্মত্ত করে তোলার জন্য,ধর্মীয় মোহে,উদ্দীপনায় তাদের ছলনা করার জন্যই সৃষ্টি করেছে। সে নেতা বলেই কিছুটা প্রয়োজনীয় জনসংযোগ তার ছিল। তবে দেশের নিম্নবর্গীয়দের সম্পর্কে তার তাচ্ছিল্য নানা কথার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ জড়িত থেকেও একটা সময় সরে এসেছিলেন তার কারণ স্বদেশী আন্দোলনের জনবিচ্ছিন্নতা। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই বিষয়টিই রবীন্দ্রনাথ মূলত তুলে ধরতে চেয়েছেন। দেশের গরীব মানুষকে যখন তারা বিদেশী বর্জন করে দামি স্বদেশী জিনিস কিনতে বাধ্য করেছে তখন তাদের জনসংযোগের মাধ্যম হয়েছে কেবলমাত্র শুষ্ক বক্তৃতা। এ ধরনের আন্দোলনের জন্য নিম্নবর্গীয় বা দেশের সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যে দীর্ঘ যোগাযোগের প্রয়োজন তা তারা অনুভবই করেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজের বহু জায়গায় নেতাদের এই সামাজিক যোগাযোগের অভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন নিম্নবর্গীয় দলিত এবং মুসলমানদের সঙ্গে সহজ সামাজিক সমন্বয় করতে বলেছেন।

সন্দীপের জনবিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গের পরেই বলা যায় সন্দীপের নীতি শূন্য বক্তব্যের কথা। সে রামায়ণের চিরাচরিত খলনায়ক রাবন কে নায়ক হিসেবে দেখতে চায়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্যারাডাইস লস্ট এর কথা। যদিও সন্দীপের এই মিথ্ ভাঙ্গা কে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ ভ্রষ্টাচার বলেই মনে হয়। সন্দীপের নারী লোলুপ আত্মাকে স্বদেশী আন্দোলনের 'Feticism' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার ব্যভিচারী মনোভাব এবং স্বদেশী নেতাদের দেশভক্তি সম্পর্কে মানুষের মনে ঘৃণারই জন্ম দেয়।সন্দীপ আগ্রাসী ফ্যাসিস্ট কায়দায় যেমন দেশকে অধিকার করার কথা বলেছে

তেমনই নারীকে অধিকার করার কথা বলেছে। বিমলার কাছে পৌঁছানোর পর নারী তার কাছে হয়ে ওঠে দেশের উপমান এবং ক্রমশই বোঝা যায় নারীই তার কাছে মুখ্য, স্বদেশী আন্দোলন তার কাছে গৌণ। রাজনীতি তার কাছে নারীকে ভোগ করার উপলক্ষ্য মাত্র।সন্দীপ বিমালাকে দুর্গা, জগদ্ধাত্রী এবং দেবী কালীর সঙ্গে তুলনা করেছে এবং বলেছে কালীর আরাধনা করতে করতেই সে বিমলাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। নিজের বিলাসিতার জন্য সে বিমলাকে ব্যবহার করেছে, বন্দেমাতারাম মন্ত্রকে অপব্যবহার করেছে দেশ লুণ্ঠন করার কাজে। সন্দীপ বিমলাকে বাহ্যিকভাবে পুজো করেছে,দেবী আখ্যা দিয়েছে, কিন্তু আসলে সন্দীপ বিমলার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়,তার ভাবনা চিন্তা পছন্দ-অপছন্দ সমস্তটাই নিজের মতো করে পরিচালনা করতে চায়। বিমালাকে সে এমন দেবী মূর্তি করে গড়ে তোলে যে দেবী তাকে তার উদ্দেশ্য সাধনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তার এই ভাবনার মধ্যে রয়েছে চূড়ান্ত স্বার্থপরতা। কারণ সে আসলে দেশের জন্য নয় নিজের ব্যক্তিগত বিলাস দ্রব্যের রসদ সংগ্রহের জন্য বেশি চিন্তিত। উপন্যাসের শেষের দিকে যখন বিমলার চুরির কান্ড ঘটে তখন সে নিজের সমস্ত নৈতিকতা,মান,মর্যাদা, আত্মবিশ্বাসকে হরণ করে নিজেকেই প্রতারণা করে। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী সন্দীপকে যদি আধুনিক ইউরোপের রূপকার্থে এবং বিমালাকে বর্তমান ভারত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তবে পাশ্চাত্য ভাবধারায় ভারতবর্ষ দুর্বল হবে,লুণ্ঠিত হবে,প্রতারিত হবে। সেই ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে উপন্যাসে সন্দীপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন পাশ্চাত্যবাহী "Nation"-এর ধারণা অনৈতিকতা এবং নৃশংসতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

অন্যদিকে নিখিলেশ বিমলা কে কেবলমাত্র স্ত্রী রূপেই নয় তাকে পেতে চেয়েছিল সঠিক জীবন সঙ্গিনী হিসেবে। কিন্তু সমস্যা হল নিখিলেশ বিমলা কে আপাতভাবে সমানাধিকার দিলেও তাকে কখনো বুঝতে চাইনি। নিখিলেশ বায়বীয় তত্ত্বে নিজের দাম্পত্য সম্পর্ক কে যাচাই করে নিতে চেয়েছে, ইউরোপীয় রোমান্টিক সাহিত্য পড়ে স্ত্রীকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছ, কিন্তু এই আদর্শের

উপযুক্ত রোমান্টিক আবেগ তার যথেষ্ট নেই একথা সে বোঝেনি।বিমলার চাওয়াটা সে বুঝতে না চেয়ে নিজের বাস্তবতা বর্জিত বায়বীয় ভাবনা বিমলার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। তথাকথিত ভাবে নিখিলেশ আদর্শ স্বামী কিন্তু বিমলার প্রত্যাশা পূরণে নিখিলেশ সার্থক হতে পারেনি। আর তাদের সেই দাম্পত্যের মধ্যে অদৃশ্য ফাটলের ভেতর দিয়েই সন্দীপ তাদের জীবনে প্রবেশ করেছে।যে পুরনো ঐতিহ্য, সতীত্বের সংস্কার নিয়ে বিমলা পিতৃগৃহ থেকে এসেছিল, তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা নিখিলেশের আচরণ এর সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই সে পায়নি। বিমলার আত্মকথা খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় প্রথম থেকেই নিখিলেশের সঙ্গে তার মানসিক বোঝাপড়া হয়নি। পুরুষের কাছে যে দুর্বার,দুঃসাহসী ব্যক্তিত্বের উজ্জলতা সে কামনা করেছিল তার তুলনায় নিখিলেশ কে তার অনেকটাই দুর্বল মনে হয়েছে। পরবর্তী পর্যায় সন্দীপের সংস্পর্শে এসে বিমলার নিজস্ব ভাষা, শব্দ বিন্যাস,শব্দ ভান্ডার ক্রমশ বদলে গেছে। তাতে ছোঁয়া লেগেছে সন্দীপের। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন নারী যখন হঠাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে ঐতিহ্যের জগৎ থেকে বিদেশী জগতে পৌঁছেছে তখন তার চোখে ধাঁধা লেগে নিজস্ব কথা ফুরিয়ে গেছে। বিলেতি পুতুলের মত মুখস্ত করা কৃত্তিম শব্দবুলি তার মুখে ফুটেছে।

উপন্যাসের শেষ দিকে মাস্টার মশাই যখন নীতিস্খলিত বিমলাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নিখিলেশ কে পরামর্শ দিয়েছেন তখন বোঝা যায় শুধুমাত্র কিছু বিলেতি আদব কায়দায় নারী শিক্ষা কে সীমাবদ্ধ রাখলে তার পরিণতি ভয়াবহই হয়। কলকাতা এখানে মুক্ত শিক্ষার প্রতীক এবং বৃহৎ জগতের প্রতীক। এইখানে আর একবার মনে হয় নিখিলেশ এর থেকেও চন্দ্রনাথ বাবু রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের অনেক বেশি কাছাকাছি। তিনি অনেকটাই সনাতন ভারতবর্ষের মুক্ত বিবেকের প্রতীক । তবে বিমলা নিখিলেশ কে যতটা দুর্বল মনে করেছে নিখিলেশ আদৌও তেমন নয় তা উপন্যাসের শেষে প্রমাণিত হয়। দাঙ্গা থামানোর জন্য যখন নিখিলেশ বেরিয়ে যায় তখন তার ব্যক্তিত্বের আসল পরিচয় পাওয়া যায়। তার এই দূঃসাহসিক আত্মোৎসর্গের বিপরীতে বিমলার পতন তাদের দাম্পত্য জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি। উপন্যাসের শেষে

নিখিলেশের অস্পষ্ট পরিণতি বিবর্তনশীল ভারতীয় দাম্পত্য ভাবনার এবং জাতীয়তাবাদের অনিশ্চয়তার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমাদের আধুনিকতা যথার্থ অর্থ সম্পর্কে সচেতন করেন এবং সঠিক অর্থে আধুনিকতা শব্দটিকে গ্রহণ করতে পথ দেখান।

৫.৬ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের রাজনীতি প্রসঙ্গ

"ঘরে বাইরে" উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন রাজনৈতিক ধারাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কয়েকটি রাজনৈতিক বিষয় কে ভিত্তি করে এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। ইংরেজিতে বিভেদমূলক রাজনীতি,স্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় দ্রব্য উৎপাদন প্রকল্প, বন্দেমাতারাম মন্ত্রের প্রয়োগ এবং মুসলিমদের মধ্যে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া,বিদেশি বয়কট এবং সেই প্রসঙ্গে বিতর্ক কংগ্রেসের চরমপন্থী এবং নরমপন্থী দুই দলের উত্থান এবং কার্যকলাপ, জনবিচ্ছিন্ন আন্দোলন,স্বদেশী ডাকাতি এবং তার অপপ্রয়োগ,শিক্ষা বয়কট এর ফলে যুব সম্প্রদায়ের দুর্বল ভবিষ্যৎ,স্বদেশী নেতাদের দুর্নীতি,স্ত্রী শিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় গুলি কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' রচনা করেছিলেন।

উপন্যাসটির রচনাকাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়। যখন বাংলা এবং ভারতের রাজনীতি স্বদেশী আন্দোলনের গঠনমূলক এবং সন্ত্রাসবাদী এই দুই ধারায় ক্রমশ ত্বরান্বিত হয়ে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম দিকে হিন্দু মেলার সময় থেকেই পারিবারিক সূত্রে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এক সময় হঠাৎই তিনি আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ সরে যান, ফিরে যান শান্তিনিকেতন। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন লেখায়। তাঁর যুক্তি ছিল এই স্বদেশী আন্দোলন হিন্দুত্ব কেন্দ্রিক মুসলমান স্বার্থবিরোধী,দরিদ্র পরিপন্থী,জনবিচ্ছিন্ন,চরমপন্থী এবং সহিংস। এই সময় থেকে ব্রিটিশ বিরোধীতার বিপক্ষে তিনি নানা বক্তব্য প্রকাশ করতে শুরু করে।১৩১২ সালের ২৬ শে অগ্রহায়ণ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কে তিনি লেখেন----

"অগ্নিকান্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে,আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব"।

আবার রাজভক্তি প্রবন্ধে তিনি লিখলেন----

"আমরা পূজা করিতে চাই--- রাজতন্ত্রের মধ্যেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের প্রাণের অনুভব করিতে চাই"।

এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের সম্পর্কে তার গভীর আসক্তি প্রকাশ করতে থাকেন।

১৯০৮-এ 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন-

"সমগ্র ভারতবাসী একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয় এই যুক্তিতে যে তাতে চেতনায় বিদ্বেষ বোধ শিকড় ছড়াবে,যা ব্রিটিশ চলে গেলে আমরা নিজেরাই পরস্পরের উপর প্রয়োগ করে বিভেদ সৃষ্টি করব"। এর পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন লেখায় রাজা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাতে রাজা অত্যাচারী হলেও যুবরাজ হবেন দয়ালু রাজা নিজে অত্যাচারী হননি,শোষণ যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করেছে অধস্তনেরা।

এই কারণে "ঘরে বাইরে" সম্পর্কে লুকাচের মন্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ-

"The hypothesis is that India is an oppressed, enslaved country,yet Mr. Tagore shows no interest in this question."

নিখিলেশ যতই স্বদেশী সাবান স্বদেশী কাপড় স্বদেশী কৃষিকে উৎসাহিত করেছেন তবুও ১৯০৭-০৮ সালে দাঁড়িয়েও ব্রিটিশ বিরোধী বা বিদ্বেষী এমনকি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কোন মন্তব্যই তিনি করেননি।

নিখিলেশের কয়েকটি স্বদেশী উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগের সঙ্গে মিলে যায়। প্রথমত,স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা পর্বে নিখিলেশ নিজেই যাবা মরিশাস থেকে আম আনিয়ে সরকারি কৃষি বিভাগের কর্তৃপক্ষের পরামর্শে আম উৎপাদনের চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয়তঃ জাপানি সিসিম এবং বিদেশী কার্পাস চাষের প্রয়াস করেছিল। তৃতীয়তঃ সরকারি ইংরেজ কৃষি পত্রিকা তরজমা করে কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিল এবং স্বদেশী সাবান,গামছা ইত্যাদির পেছনে বহুকাল হরণ করার পর অনুভব করেছিল যে ম্যানচেস্টার বা লিডসে পাল্লা দেওয়া আদৌ সম্ভবপর নয়। সন্ত্রাসবাদি বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছোট-বড় নানা প্রবন্ধে লিখেছেন----

"স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয় পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি... দেশভক্তির আলোক জ্বলিল কিন্তু সেই আলোতে এ কোন দৃশ্য দেখা যায়... এই চোরের পথ,আর ধারের পথ কোন চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিত না"। ১৯১৬ সালে 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হলে মানুষের অভিযোগ ওঠে সন্দীপের মত অসৎ ভোগী কপট ও নারী লোলুপ স্বদেশপ্রেমিক বাস্তবে দেখা যায় না,যেখানে অমূল্য একজন খাঁটি কিশোর বিপ্লবী চরিত্র প্রমাণ করে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শগত কিছুটা নিরপেক্ষতা যদিও অমূল্য আদর্শ নিয়ে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে কোথাও পৌঁছতে পারেনি।

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্দীপ বিমলাকে দেশমাতৃকা রূপে চিহ্নিত করেছে। সে সন্দীপ ও নিখিলেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং যুক্তিবাদী নরমপন্থীর মধ্যে দীর্ণ হয়েছে। কখনো বা সে তাদের বক্তব্যের শ্রোতা হয়েছে, আবার কখনো সে তাদের সঙ্গে আলোচনায় রত রয়েছে, আবার কখনো তাদের কাজে উৎসাহ দিয়েছে। এই দুই বিপরীত ব্যক্তিত্বের মধ্যে তার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন যেন এই দুই বিপরীত পন্থার বিরোধে পরিণত হয়েছে এবং উপন্যাসের মাঝামাঝি পর্যায়ে যখন সন্দীপের জ্বালাময়ী ভাষণ উদ্দীপক আঙ্গিক অভিনব, তার বাকচাতুর্য, ছলা-কলা বিমলাকে শারীরিক আকর্ষণের নৈতিক স্খলনে পৌঁছে দিয়েছে তখন মোহে দিকভ্রান্ত বিমলাই উগ্র স্বদেশী জাতীয়তাবাদীদের অন্তঃসারশূন্য আপাতত সৃষ্টিকারী উত্তেজক নেতৃত্বের প্রতি দিশাহীন ভারতবাসীর জন্য উন্মাদনাকে প্রতীকায়িত করে। এই তাৎপর্যই প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন---

"নিখিলেশ হচ্ছে প্রাচীন ভারতবর্ষ সন্দীপ নবীন ইউরোপ বর্তমান ভারত"।

নিখিলেশ ও সন্দীপের এই বিরোধকে আন্তর্জাতিকতা, জাতীয়তাবাদ,নরমপন্থী ও চরমপন্থী এইরকম একাধিক "বাইনারি অপোজিটস"-এর ছকে ফেলে তাদের মধ্যে ডায়ালেকটিক ডিসকোর্সের প্যাটার্নে উপন্যাসকে বিচার করাই যায় কিন্তু সমালোচকেরা সব জায়গাতেই নিখিলেশকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং নিখিলেশের দিকেই কাহিনীর পক্ষপাত কে চিহ্নিত করেছেন।কিন্তু উপন্যাসটি শেষ অংশটুকু লক্ষ্য করলে সেখানে যদিও বিমলা সন্দীপের মায়াজাল কেটে অনুভূতির ক্ষেত্রে দাম্পত্যের একনিষ্ঠ প্রত্যাবর্তন করেছে একথা ঠিক কিন্তু নিখিলেশের পরিণতি নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে কিন্তু উপন্যাসটির পাঠ আরো জটিল হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের শেষে নিখিলেশ চূড়ান্তভাবে আহত হয়েছে অথবা তার মৃত্যু আসন্ন হয়েছে এ দুটির মধ্যে ধোঁয়াশা থেকেই যায়।কেননা সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করে নায়কের মৃত্যুর কথা স্পষ্টভাবে বলা রবীন্দ্রনাথের কোন কালেই ছিল না। কিন্তু মুক্তধারার অভিজিতের মৃত্যুতে শিবতরাইবাসী জলসংকট থেকে মুক্তি পেয়েছিল,রঞ্জনের মৃত্যুতে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি ধসে গিয়ে গণঅভ্যুত্থান ঘটে ছিল। কিন্তু নিখিলেশ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা থামাতে গিয়ে যে শহীদ বা প্রায় শহীদ হল তাতে কি দাঙ্গা থামবে! না সন্দীপ্ত তার রংপুরের পলায়ন মূলক অভিযান বাতিল করে নিখিলেশের পথে ফিরে আন্দোলন প্রত্যাহার করবে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাবর্তন দেখালেও নিখিলেশের তরফ থেকে চূড়ান্ত ইতিবাচক কোনো পরিণতি রাখেননি। উপন্যাসের সন্দীপের রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলবার নেই।কেননা তার কোনো নীতিই নেই। সে তার আত্মকথায় নিজের মনের কথা যখনই প্রকাশ করে তখনই তার অধিকাংশ সময়ই নারী বুভুক্ষতার কথাই প্রকাশ পায়। রাজনীতি তার কাছে সহজে অর্থ উপার্জনের, বিভিন্ন নারীর সঙ্গে ব্যভিচারী সম্পর্ক সৃষ্টি করার এবং একই সঙ্গে দেশজুড়ে পপুলিস্ট নেতৃত্বের সস্তা খ্যাতি অর্জন করার একটা কুৎসিত মাধ্যম। তবে নিজের এই কুৎসিত মানসিকতাকে সে তার বুদ্ধিদীপ্ত চাতুর্যে কেবলমাত্র আত্মকথাতেই সীমাবদ্ধ করে রাখে,না হলে স্বদেশী নেতৃত্বে আপাত মহিমাময় ঔজ্জ্বল্যে পৌঁছেছে তা কখনই সম্ভবপর হতো না।

এই উপন্যাসে আদ্যোপান্ত রবীন্দ্রনাথ অতি সচেতন ভাবে মদ বা মত্ততার এবং আগুনের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের মদমত্ততা যেমন তাতে শিল্পিত রূপ পেয়েছে তেমনি আগুনের চিত্রকল্পগুলোর ব্যঞ্জনা আমরা পাই, ব্যাচার্থে এই আগুন বিদেশি দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলার রাজনীতি। এ আগুন কামনার আগুন। যা জীবনের সমস্ত সত্য সম্পর্কগুলোকে ধ্বংস করে দেয় এবং সারা উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই আগুনে চিত্রকল্প যখন উপন্যাসে দাঙ্গার আগুনে পরিণত হয় তখন বোঝা যায় স্বদেশী আন্দোলনের এই রাজনৈতিক দাহ বিমলার জীবন বদলে দিল এবং এই আগুনে প্রায় ভস্মীভূত করে দেবে ভারতবর্ষের আগামী জীবনকে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা বেশ জটিল এবং বহুমাত্রিক। তিনি ভারতে ব্রিটিশের উপস্থিতিকে অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন।তবে ব্রিটিশ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে তাঁর মতামত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম রয়ে গেছে, সেটা হলো তাদের আসার ফলে

ভারতীয়দের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি উন্নত হয়েছিল এটা ইতিবাচক দিক এবং অন্যদিকে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক লুণ্ঠন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিক।।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে কিভাবে জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে তোলে তারাই, যারা এর থেকে সর্বাধিক লাভবান হন অর্থাৎ একটি সম্প্রদায় এবং উন্নতকামী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং সমাজের বাকি অংশ এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে বর্জন করেন এই যুক্তিতে যে এটি একটি মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করার সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠন।যার সঙ্গে মানবিকতা, মনুষ্যত্ব,আত্মত্যাগ এবং জনস্বার্থের বিন্দুমাত্র কোন সম্পর্ক নেই। উপন্যাসে নিখিলেশ যখন বলে দেশের সত্য তার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তখন আমরা বুঝতে পারি একথা রবীন্দ্রনাথের নিজের।এ সত্য বলতে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের সত্যকে বুঝিয়েছেন। উপন্যাসের শেষে যখন নিখিলেশের কাছে খবর আসে পাশের জমিদারিতে মুসলিমরা দাঙ্গা বাঁধিয়েছে,তখন সে স্বার্থান্বেষী জমিদারি হিসেবে নয় শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের তাড়নায় বেরিয়ে যায়। যাবার সময় তার হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। এটা আসলে অহিংসার ব্যঞ্জনা। তার সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয় যে অস্ত্র হাতে কোন দমনমূলক রাজনীতিতে সে বিশ্বাসী নয়। বলা যায় রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা কে এই ভাবেই চরিত্রগুলোর মাধ্যমে "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১. ঘরে-বাইরে কত সালে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল?

উত্তর-ঘরে বাইরে উপন্যাসটি ১৩২২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৫ সালে "সবুজপত্র পত্রিকা"-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

২. ঘরে বাইরে উপন্যাসের গঠন দেখে সম্পর্কে দু-চার কথা লেখ।

উত্তর-'গোরা' রচনার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণ যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তারই একটি বিশিষ্ট পর্যায় "ঘরে-বাইরে"-তে লক্ষ্য করা যায়। 'গোরা' পর্যন্ত কাহিনীর বক্তা লেখক নিজেই। "চতুরঙ্গ" তে লেখক কাহিনী বর্ণনার দায়িত্ব দিয়েছেন

উপন্যাসের চরিত্রের উপর। আর "ঘরে-বাইরে" তিনটি চরিত্রের আত্মকথার সমন্বয়ে রচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই উপন্যাস এই রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলিত ভাষার ব্যবহার করেছিলেন।

৩. ঘরে বাইরে উপন্যাসের রাজনীতি সম্পর্কে দু-চার কথা লেখ।

উত্তর-উপন্যাসটির রচনাকাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়। যখন বাংলা এবং ভারতের রাজনীতি স্বদেশী আন্দোলনের গঠনমূলক এবং সন্ত্রাসবাদী এই দুই ধারায় ক্রমশ ত্বরান্বিত হয়ে চলেছিল।

৪. ঘরে বাইরে উপন্যাসে সন্দীপ চরিত্রটি সম্পর্কে পাঠকদের কি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়?

উত্তর-১৯১৬ সালে 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হলে মানুষের অভিযোগ ওঠে সন্দীপের মত অসৎ ভোগী কপট ও নারী লোলুপ স্বদেশপ্রেমিক বাস্তবে দেখা যায় না।

৫.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. ঘরে বাইরে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সামাজিক ঐতিহাসিক পটভূমি কিভাবে প্রভাব ফেলেছে তা লেখ।

২. ঘরে বাইরে উপন্যাসের গঠনরীতি রবীন্দ্রনাথ রচিত পূর্ব উপন্যাস গুলির থেকে ভিন্ন রীতির আলোচনা করো।

৩. ঘরে বাইরে উপন্যাসের রাজনীতি সম্পর্কে লেখ।

৪. ঘরে বাইরে উপন্যাসের সমাজনীতি প্রসঙ্গ আলোচনা করো।

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সুকুমার সেন।

২. ঘরে-বাইরে- ড.গোকুলানন্দ মিশ্র।

৩. রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা সত্যব্রত দে

৪. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা- শ্রী ভূদেব চৌধুরী

৬. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস- অমরেশ দাস

৭. উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি- উজ্জ্বল কুমার মজুমদার

একক ৬ ঘরে বাইরে- উপন্যাসের চরিত্র

বিন্যাসক্রম

উপন্যাসের চরিত্র

৬.১ নিখিলেশ

৬.২ বিমলা

৬.৩ সন্দীপ

৬.৪ মেজবউরাণী

৬.৫ চন্দ্রনাথবাবু

৬.৬ অমূল্যচরণ

৬.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

মুখ্য চরিত্র

৬.১ নিখিলেশ

ঘরে বাইরে উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশ। রবীন্দ্রনাথের মানব চেতনার দিকটি সঙ্গে খানিকটা মিলে যায় নিখিলেশ। উপন্যাসের সত্য কল্যান ও সুন্দরের প্রতিমূর্তি হল নিখিলেশ। নিখিলেশের অবস্থান পারিবারিক জীবন পটভূমিতে,রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুতে। উপন্যাসের সন্দীপ ও নিখিলেশ বিপরীত শক্তি হলেও নিখিলেশের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। নিখিলেশ নারীকে আপন চেতনার দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বল প্রয়োগের দ্বারা নারীকে অধিকার করার কোনো

রকম মানসিকতা তার নেই। এ প্রসঙ্গে বলা যায় প্রেম ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কালিদাস এর উত্তর সাধক। আর সেই কারণেই হয়তো তুমি সবসময় পরম শুদ্ধতায় প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন,বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়।যা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। নিখিলেশের চরিত্রের শান্তি ও সংযম দুটি বর্তমান। তার প্রেম ভাবনা কখনোই সংযমের গণ্ডি পেরিয়ে যায় নি। ক্ষুদ্র তাই বন্দি না হয়ে নারী-পুরুষের প্রেম বন্ধন হৃদয়ের ভেতর প্রসারিত হোক নিখিলেশ তাই চাইতো অর্থাৎ প্রেমের কল্যাণী মূর্তিতে নিখিলেশের বিশ্বাস ছিল, কেবল ক্ষণিকের মোহে নয়। সেই কারণেই নিখিলেশ বিমলাকে বলে-

"আমি চাই,বাইরের মধ্যে আমাকে পাও,আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।...তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও"।

নিখিলেশ এমন এক সত্যনিষ্ঠ পুরুষ যে সমস্ত কলুষতা থেকে নিজেকে সবসময় সরিয়ে রেখেছে। বিমলার ওপর যেমন সে স্বামীত্বের দাবি চাপিয়ে দিতে চায়নি, তেমনি সে মনে করেছে বিমলার একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। তাই সে সমাজ সংসারের বাইরে স্ত্রী বিমলার স্বতস্ফূর্ত প্রেমের আশা করেছে। এই নিখিলেশ যেন রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিফলন। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছেন- "কেবলমাত্র নিজের রুচি,ইচ্ছা ও প্রয়োজনের দিক থেকে প্রতিমাকে(পুত্রবধূ) দেখলে হবে না-ওর নিজের দিক থেকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে"। নিখিলেশ উপন্যাসেও বলে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকার জন্য আমার জন্ম হয়নি। তবে এর পাশাপাশি নিখিলেশ যথার্থই একজন প্রেমিক সত্তায় পরিপূর্ণ পুরুষ তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার কথাতেই-

"আমি প্রেমিক সেই জন্য তালা দেওয়া সিন্দুকের জিনিস চাইনি----আমি তাকেই চেয়েছিলাম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতি-সংহতির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি"। কিন্তু মানুষের জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব টা সহজ নয় বলেই নিখিলেশের সারাটা জীবন নিজের ভাবনার সঙ্গে

কর্তব্যের, মানসিক দ্বন্দ্বের বোঝাপড়া করতে করতে কেটেছে। প্রতিনিয়ত মানবিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে নিখিলেশকে প্রতীক্ষা করতে হয়েছে বিমলার যথার্থ শুদ্ধ প্রেম অনুভবের। আর তা সম্ভব হয়েছে তার সহনশীলতার জন্যই। নিখিলেশ নিজে শুদ্ধ প্রেমিক তার প্রেমিক সত্তার ভিতর কোন কলঙ্ক নেই। এখানেই নিখিলেশের সঙ্গে সন্দীপের পার্থক্য।

আধুনিক উপন্যাস এ ট্র্যাজিক চরিত্রের লক্ষণ গুলো বিচার করে নিখিলেশ কে সেই শ্রেণীতেই ফেলা যায়। কারণ তার অন্তরের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা সে জনসমক্ষে তুলে ধরেনি। নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়তায় শেষ থেকে ব্যক্তি হৃদয় কে জোর করে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়নি। আর তার অন্তর বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখেছিল বলেই শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়েছে, জয় হয়েছে তার প্রেমের। এখানেই সন্দীপের সঙ্গে তার পার্থক্য। সন্দীপের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সে সবসময়ই আলগা চটুল বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে নারীর মন জয় করতে চেয়েছিল।

বিমলার মুক্তি ঘটার পর ও নিখিলেশ কে নির্লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। সমালোচক দের কাছে ব্যাপারটি যদিও অসহনীয় হয়েছে। কিন্তু সে বিমালার অবহেলা সহ্য করেও উদার ও নিলিপ্ত থাকতে পেরেছে যা খুব একটা সহজ নয়।যন্ত্রণা কি সহ্য করে স্থির বিশ্বাসে অবিচল থাকা যথেষ্টই প্রশংসনীয়। দুঃখকে জয় করাটাই প্রকৃত গুনের কাজ। তাইতো শেষ পর্যন্ত বিমলা বলতে পারে----

"সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলাম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তার গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন"।

আর তার এই গভীর বেদনা কে যারা উপলব্ধি করবেন তারাই ট্র্যাজিক চরিত্রের মহিমায় নিখিলেশ কে মহিমান্বিত করবে। নিখিলেশের জীবন একেবারেই একমাত্রিক নয়। সে নিজের জীবনকে ছড়িয়ে দিয়েছে ঘরে বাইরে। ঘরে সে শুধুমাত্র দাম্পত্য প্রেমে মগ্ন থেকেছে, বৌঠান দের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। আর বাইরে সে দেশের জন্য কাজ করে গেছে। দেশ বলতে তার কাছে কেবল দেশের

মাটি নয় দেশ বলতে সে বোঝে দেশের মানুষ কেউ। মানুষ বলতে বোঝে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই। সে জানে ভারতকে বাঁচাতে হলে রক্ষা করতে হলে উভয় একত্রে মিলেই পারবে। সে যেমন ইংরেজদের শাসন এর প্রতিবাদ করেছে তেমনি বিদেশি দ্রব্য বয়কটের নামে গরিব মানুষদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। নিখিলেশ কাউকে প্রভাবিত না করে নিজের সত্যে নিজেকে উজ্জ্বল করতে চেয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁর সক্রিয় প্রভাবে বিমলা যেমন নিয়ন্ত্রিত হয়,তেমনই নিয়ন্ত্রিত হয় সন্দীপ। সন্দীপ যে তার স্বদেশীর কাজে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না তা নিখিলেশের পরোক্ষ প্রভাব এর জন্যই। তবে শুধু সন্দীপই নয়, মেজোরানী,চন্দ্রনাথ বাবুদের ওপরের নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়েছে। মুসলিম প্রজারা নিখিলেশকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতো। আসলে উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়েছে। যা তাদেরকে সময় সময় বদলে দিয়েছে। সে কারণেই নির্দ্বিধায় নিখিলেশ কে এই উপন্যাসের নায়ক বলা যায়। তবে উপন্যাসের নায়ক হিসেবে নয় প্রেমের সত্যের কল্যাণের মূর্ত প্রতীক হিসেবে নিখিলেশ বেশি উজ্জ্বল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেম ভাবনার আদর্শকে মানব সত্যে রূপায়িত করেছেন নিখিলেশের মধ্য দিয়ে,তার মধ্যে নির্মাণ করেছেন এক বিশ্বাস প্রত্যয়-এর জগত। সবচেয়ে উল্লেখ্য 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ একজন প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ পুরুষ হয়েও আসলে সে নিতান্তই একজন মানুষ তাই বারবার প্রত্যক্ষ করি আমরা। এখানেই নিখিলেশ চরিত্রটির সার্থকতা।

৬.২ বিমলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নায়িকা বিমলা। ইতিপূর্বে সৃষ্ট বাংলা উপন্যাসের নায়িকাদের তুলনায় বিমালা বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্যের নায়িকারা এর পূর্বে চিরাচরিত কিছু সংস্কার এবং সতীত্বের মিথ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিমলা তা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে গেছে। একদিকে প্রবৃত্তির অমোঘ টান অন্যদিকে সংস্কারের দ্বন্দ্বে নায়িকারা এতদিন পর্যন্ত সামাজিকতা ও নৈতিকতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে শেষ অব্দি সংস্কারকেই মেনে নিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নায়িকা শৈবলিনী বাল্য প্রেমিক প্রতাপের

জন্য ঘর ছেড়েছে বলে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ভয়ঙ্কর নরক দর্শন করে তবেই স্বামী চন্দ্রশেখরের আশ্রয় ফিরে আসতে পেরেছিল। আবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ রোহিণী অবৈধ সম্পর্কে গোবিন্দলালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় শেষে তাকেই গোবিন্দলালের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'-র বিনোদিনী ও 'চতুরঙ্গ'-এর দামিনী অবশ্য এদের তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত মানবী। অবশ্য রোহিনী, বিনোদিনী ও দামিনী এই চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এরা তিনজনেই বিধবা এবং বিধবা বিবাহ তখন আইন স্বীকৃত। অতএব বিধবা নারীর কামনা ও সংসার বাসনাকে উপন্যাসে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে আইনত কোন বাধা যেমন ছিল না, তেমনি সামাজিক বাধা ও ধীরে ধীরে কমছিল। কিন্তু বিমলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেন আরো অনেকটা সাহসী হয়ে উঠেছেন। বিমলা সধবা ও স্বামী প্রেমে গরবিনী। সেই বিমলা স্বামীর সামনেই স্বামীগৃহে বাস করে স্বামীর বন্ধু সন্দীপ এর প্রতি আকর্ষণ ও প্রবৃত্তির টানে স্বামীর সাথে মানসিক ব্যবধান গড়ে তুলেছে। সমাজ, সংস্কার, নৈতিকতা তাকে বিচলিত করেনি। তাই বিমলা বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিক ছক থেকে বেরিয়ে আসা,মৌলিক এবং সাহসী একটি চরিত্র।

নিখিলেশ ও সংসারের প্রতি প্রেম বিমলার সংস্কার এবং সন্দীপ ও তার দেহযুক্ত টান তার প্রবৃত্তি এই দুইয়ের বৃত্তের কারণ ছিল ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণবাদ,অবচেতনেই নিহিত যৌন চেতনার অপ্রতিরোধ্য চাহিদা। আর প্রবৃত্তিকে জয় করার অনুকূল হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন।

উপন্যাসের প্রথমে বিমলার আত্মকথায় তাকে সাধারণ বাঙালি তথা ভারতীয় নারীর মত স্বামী ভক্তি পরায়ন হিসেবেই দেখা যায়। স্বামীকে ভক্তি করা,পুজো করা তার কাছে একটা সংস্কার। তাই স্বামীর ফটোতে ওর চিঠিতে সে ফুল দিয়ে পুজো করেছে----

"একটি চন্দন কাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তার চিঠিগুলো রাখতুম,আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম"। বিমলার আত্মকথায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তার এই ভক্তির কথা। কখনো সে বলেছে---"মেয়ে মানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও এমনি সহজ কথা।" আবার কখনো সে বলেছে---- "আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল সে ভক্তি করবার ব্যগ্রতা"। আসলে ভক্তির এই সুর সে লাভ করেছিল তার মায়ের থেকেই। কিন্তু প্রকৃত প্রেম সেখানে ছিল না। বিমলা কেবল এই ভক্তি কে প্রেম বলে জেনেছে ও মেনেছে।

আর তার এই ভক্তি থেকেই তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল সতীত্বের অহংকার। বিমলা নিজেই সে কথা স্বীকার করেছে---

"তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের।সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে, এটা আমার মনে ছিল"। তবু মেজো জায়ের প্রতি তার মন সন্দিগ্ধ হয়েছে।

নিখিলেশের জীবন দর্শন ছিল বিমলার বোধগম্যের বাইরে। তাই বল প্রয়োগে,জোরজবরদস্তিতে বিশ্বাসহীন,মুক্তচিত্ত,উদার নিখিলেশ বিমলার চোখে ছিল পৌরুষের তেজহীন পুরুষ। বিমলা নিজে সেই কথা স্বীকার করেছে----

" সত্য কথা বলব?অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি,আর--- একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।" "আমার মনে হতো, ভালো হবার একটা সীমা আছে,যেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়।"

বিমলার আরো একটি স্বভাব হল হুজুগে গা ভাসানো।তাই "এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগলো আমি প্রথমেই স্বামীকে বললুম, বিলিতি জিনিসে তৈরী আমার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলব।" এমনকি মিস গিলবি কে ঢিল ছোঁড়াটাও

তার কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়নি।

এই বিমলা যখন একদিকে পৌরুষের অন্বেষণে আর অন্যদিকে স্বদেশপ্রেমের হুজুকে মত্ত তখনই তার সামনে এসে দাঁড়ায় সন্দীপ। যার মধ্যে সে খুঁজে পায় পৌরুষের তেজ আর দেশ ভক্তির উন্মত্ততা।আসলে স্বামী ভক্তিকে প্রেম বলে ভুল করেছিল বিমলা। প্রকৃত প্রেম সেটা ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখানেই ছিল একটা মস্ত ফাঁক ।যার মধ্যে দিয়ে সন্দীপ সহজেই বিমলা নিখিলেশের দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করেছিল।

একদিন বিমলা বলেছিল----- "সবচেয়ে আমার বিরক্ত লাগতো সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন।" সে বুঝেছিল সন্দীপ স্বদেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ নয়।"আমার কেবলই মনে হতো বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্ছে। কেননা ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরীবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে।"অথচ সেই বিমলাই সন্দীপের দৃপ্ত ভাষণে, দেশমাতৃকার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের

আহবানে, তার আদর্শ নায়ককে খুঁজে পেয়েছিল। দাম্পত্যের ফাঁক না থাকলে কখনোই তা সম্ভব হতো না।

সন্দীপের প্রথম বক্তৃতাতেই বিমলা মোহ মুগ্ধ হয়ে পড়ে--- "সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ এবং অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম।ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল।" এই কেন্দ্র চ্যুতির ফলে বিমলার জীবনেও ঘটে গেল বড়োসড়ো পরিবর্তন। নিখিলেশের কেন্দ্র ত্যাগ করে বিমালা পৌঁছলো সন্দীপের কেন্দ্রে। নিখিলেশের প্রতি তার অবজ্ঞা নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠল---"আমার ভয় হতে লাগল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপক রাগিনীর সঙ্গে তান না মিলিয়েই কোন কথা বলেন...তাহলে সেদিন আমি তাকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম"। এর আগে নিখিলেশের বহু অনুরোধেও বিমালা বাইরে আসেনি অথচ আজ সে নিজেই সন্দীপের সামনে উপস্থিত থেকে তাকে খাওয়াতে চায়। রংপুর যাওয়া বাতিল করে সন্দীপ ইচ্ছা পূরণ করে।রূপের গৌরব না থাকার জন্য বিমলা কষ্ট অনুভব করেছে।তবুও নিজেকে যতদূর সম্ভব সুন্দর করে সাজিয়েছে।তার কথার মধ্যেও এমন চমকপ্রদ নয় যে তা সন্দীপকে আকর্ষণ করতে পারে--- এই গ্লানিও আছে তার।

সন্দীপের স্তুতিতে তার মোহের ঘোর ক্রমশ বেড়েছে।সন্দীপ বিমলা সম্পর্কে বলেছে "মৌচাকের মক্ষীরাণী" ।বড়ো জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা,মেজোজায়ের সশব্দ পরিহাস,নিখিলেশের নীরবতা ও একাকীত্ব---কোনো কিছুই আর তাকে বিচলিত করে না।তার অজান্তেই তার কাছের সম্পর্কগুলোর বাধন আলগা হয়ে গেছে-" আমার"আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চলছিল,তখন আমার মন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইলো যে আমি টেরই পেলুম না,কত বড়ো নিষ্ঠুর একটা কান্ড ঘটছে" ।সে বিশ্বাস করে-

"সেদিন সমস্ত দেশে যা-কিছু চলছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু,আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি" ।প্রকান্ড একটা দায়িত্বের গৌরবের কারণ ছিল সন্দীপের স্তুতিগান এবং বিমলার অবচেতনের দেহচেতনা-" হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল?সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখে আমার সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠলো।রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য,সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়া কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর ঘন্টার মতো আকাশ ফাটিয়া বাজতে

লাগলো। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে"। তাই সন্দীপের অপমানে সে নন্কুকে ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছে,সন্দীপের খাওয়ার সময় মুগ্ধ নয়নে তার দিকে চেয়ে থেকেছে,স্ত্রী পুরুষের মিলন নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট আলোচনার ইংরেজি বই পড়ে আনন্দ পেয়েছে। সন্দীপও বুঝেছে-"

তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ,স্বভাবের রসে টসটস করছকরছ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্ত মাংস সাড়া দিতে শুরু করেছে"।

সন্দ্বীপের প্রতি অমোঘ টানে বিমল উচিত-অনুচিত হারিয়ে যায়। সন্দীপ বিমলার ছবি নিজের কাছে রাখলে বিমলা কোন কথা বলে না। বরং সে নিজেও সন্দীপের ছবি লুকিয়ে রাখে এবং সংগোপনে সেই ছবির দিকে চোখ রাখে সন্দীপের নেশায় মত্ত বিমলা বলে---"যে নেশায় আমাকে পেয়েছে,সে নেশাটা ছেড়ে যায় এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারিনে"।

কিন্তু ক্রমে দেশপ্রেমিকের আড়াল থেকে সন্দীপের লোভী পুরুষের চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। তাই তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়েছে।এখন তাদের আলোচনার বিষয় স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ।যে কথায় খুব মোটা তারের সুর বাজে। যে সুরের সাক্ষী বিমলা আগে কখনো হয়নি।ক্রমে সে বুঝেছে সন্দীপের পৌরুষ চাঞ্চল্য মাত্র---" এও আমি, প্রথমে না হোক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে,সন্দীপের মধ্যে যে জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্য মাত্র। তাই নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেই জীবনে সে কোন স্বাদ পায়নি। তাই আবারও সন্দীপের চিঠি আসতেই সে ছুটে গেছে বাইরের ঘরে। ঘর আর বাইরে তার মধ্যে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। সন্দীপ এর কাছে নিজেকে শক্তিরূপিণী প্রমাণ করতে নিজেকে মেকি সাজে সজ্জিত করে নিখিলেশ এর কাছে বিলিতি কাপড়ের আমদানি বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু নিখিলের সেই আবদার রাখেনি। অভিমানি বিমলা তাই সন্দীপ দিয়েছে স্পর্শের অধিকার। তাই সন্দীপ বলে----"আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম,সে হাত ছাড়িয়ে নিলেনা,থরথর করে কেঁপে উঠলো"। সন্দীপ কে সে তুমি বলে সম্বোধন করেছে। তার চরণে সর্বস্ব অর্পণ করে তার দুই পা জড়িয়ে ধরে বিমলা কেঁদেছে। এখানে তার মোহ পৌঁছেছে চরম পর্যায়ে।বিমলার দুর্বলতার সুযোগে সন্দীপ চরিতার্থ করতে চেয়েছে তার অর্থ পিপাসা কে। অথচ এই সহজ সত্যটা বুঝতে বিমালার অনেক সময় লেগে গেছে। অথচ নিখিলেশের দেওয়া 'ছুটি'ও সে গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের দাম্পত্যের মাঝে যে বিশাল ফাঁক থেকেছে তা সে অনুভব করেছে----"ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক... আদর

নেই...আসবাব আসবাব। অর্থাৎ সন্দীপের মোহ এবং ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্য এই দুইয়ের মাঝে বিমলা বিহ্বল হয়ে পড়েছে। এই সময়ে বিমলার জীবনে এসেছে অমূল্য। যাকে দেখে তার হৃদয়ে জেগে উঠেছে মাতৃস্নেহের ধারা। তাই সন্দীপ এর কঠোর বাক্য গুলি অমূল্যের মত একটা নিষ্পাপ সরল বালকের মুখে শুনে সে চমকিত হয়েছে। সন্দীপের গ্রাস থেকে অমূল্যকে বাঁচাতে চেয়েছে। তাই টাকার যোগাড় করার জন্য অমূল্যকে ডেকে পাঠালেও শেষ পর্যন্ত সেই কাজ সে নিজেই করেছে। একসময় বিমলা বড় জা এবং মেজো জাকে চোর বলে ভেবেছে।তার মনে হয়েছে নিখিলেশ কে ভুলিয়ে ও ফাঁকি দিয়ে তারা নিখিলেশের টাকা নিয়েছে বারবার। কিন্তু একসময় বিমলাকেই সেই জায়েদের টাকাই চুরি করতে হয়েছে। এ চুরি আসলে বিশ্বাসের চুরি,ধর্মের চুরি,বিমলা তা বোঝে।বিমলার অমূল্যর প্রতি স্নেহ ক্রমশ সন্দীপকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল এবং অমূল্যর প্রতি সন্দীপের ঘৃণ্য ক্রোধ জন্ম নিল। সন্দীপের চারিত্রিক দুর্বলতা,স্বভাবগত দূর্বলতা বিমলার সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিমলার কাছে সন্দীপ আর আজ ---"সেই বীরের মূর্তি নেই। ওর কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ লাগছে।"

সন্দীপের মোহ তার কেটে গেছে,অথচ নিখিলের সঙ্গে তার সম্পর্ক আর সহজ নেই। বিমলার জীবনে শুরু হয় নিঃসঙ্গতার লড়াই।তার জীবনে নেমে আসে ট্রাজেডি। সমস্ত নেতিবাচকতা থেকে সে ঘুরে দাঁড়াতে চায়।দুশ্চিন্তাগ্রস্থ, নিঃসঙ্গ, মানসিক আশ্রয়হীন বিমলা মাটির উপরে লুটিয়ে কেঁদেছে। সে বলেছে ---"এমন একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই,একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস ,একটা এমন আশ্বাস যেসব চুকে যেতেও পারে"এবং সর্বোপরি সেই ক্ষমা,আশ্রয়,আশ্বাস সে নিখিলেশের কাছ থেকেই পেয়েছে।ক্রন্দনরতা বিমলার মাথায় নিখিলেশ হাত বুলিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছে।আর বিমলা নিখিলেশের পা বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে সমস্ত ভার লাঘব করতে চেয়েছে। সে নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে চেয়েছে।তাই বিধাতাকে উদ্দেশ্য করে সে বলেছে----"সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি করো।নইলে আমি আর কোন উপায় দেখিনে।"

অমূল্য টাকা ফেরত দিতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ার প্রসঙ্গে সব জেনেও নিখিলেশ নিজের স্বভাব এই নিশ্চুপ থেকেছে। অমূল্যের অনিষ্টের আশঙ্কায় বিচলিত বিমলা স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু তার চুরি ধরা পড়ার আশঙ্কায় সে শঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু এখানেও নিখিলেশের উদারতা তাকে রক্ষা করেছে। নিখিলেশ বলেছে---- "বিমল নিজে যা হতে পারত, তা আমার

চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারেনি বলেই নিচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ খইয়ে ফেলেছে। এই ছ'হাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েছে, আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারেনি"। নিখিলেশের এই উদারতা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বিমলার কাছে কেবল ভক্তি নয় প্রকৃত প্রেম হয়েই শেষ অবধি ধরা দিয়েছে। নিখিলেশের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে বিমলা সবকিছু নতুন করে শুরু করতে চেয়েছে। এতদিন সে জীবনের প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছে। নিখিলেশ এর প্রতি ভক্তি স্তর পেরিয়ে সত্য প্রেমের পথ ধরেছে। পথভ্রষ্ট হয়ে সে যা ভুল করেছিল তার যথেষ্ট মূল্যই তাকে দিতে হয়েছে। আর এই মহামূল্যবান সম্পদকে সে হারাতে চায়না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাওয়া তার হয়নি। যে অমূল্য কে বিমলা মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিল,ভেবেছিলো ---"জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এসো এই বর আমি কামনা করি"। সেই অমূল্য মুসলমানদের অত্যাচার রুখতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। আর নিখিলেশ মাথায় চোট নিয়ে ফিরে এসেছে। নিখিলেশের কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে সন্দীপের কেন্দ্রে প্রবেশ করে যে পাপ করেছে,ছদ্ম স্বদেশপ্রেমের ভন্ডামীতে ভুলে সে যে ভুল করেছে,তার প্রায়শ্চিত্ত তাকে তার পাপের স্থান থেকেই করতে হবে। অমূল্য মৃত্যু এবং নিখিলেশের চোট এই ঘটনার মধ্য দিয়েই তার প্রায়শ্চিত্ত সূচনা হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই পাপের গণ্ডি পেরিয়ে প্রায়শ্চিত্তের গন্ডিতে প্রবেশ করতে পেরেছে খুঁজে পেয়েছে জীবনধারণের সত্য এবং সঠিক রসদ। প্রকৃত প্রেম কেউ চিনে নিতে পেরেছে সে। এখানেই বিমলা চরিত্রের সার্থকতা।

৬.৩ সন্দীপ

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তিনটি কেন্দ্রবিন্দুর একটিতে অবস্থান করছে সন্দীপ। নিখিলেশ এবং বিমলার দাম্পত্যজীবনে যে ফাঁক রয়ে গিয়েছিল সন্দীপ সেই ফাঁকেই প্রবেশ করেছিল তাদের জীবনে। উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের সঙ্গে সন্দীপের বিস্তর ফারাক।

১৯১৬ সালে 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হলে মানুষের অভিযোগ ওঠে সন্দীপের মত অসৎ ভোগী কপট ও নারী লোলুপ স্বদেশপ্রেমিক বাস্তবে দেখা যায় না,যেখানে অমূল্য একজন খাঁটি কিশোর বিপ্লবী চরিত্র প্রমাণ করে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শগত কিছুটা নিরপেক্ষতা যদিও অমূল্য আদর্শ নিয়ে শেষ পর্যন্ত

হারিয়ে গেছে কোথাও পৌঁছতে পারেনি।অর্থাৎ উপন্যাসের আখ্যান স্বদেশী আন্দোলনের সার্বিক ব্যর্থতার নৈতিক স্খলনে বস্তুত সন্দীপের মতো ভণ্ড দেশপ্রেমিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভোগের সংগ্রহের জন্য পাশবিক চরিতার্থ করার জন্য ক্ষণে ক্ষণে বন্দেমাতারাম মন্ত্র আওড়ে অন্তরে খাঁটি স্বদেশী নেতার অভিনয় করে চলে এমন চরিত্র বাস্তবে সম্ভব তা নিয়ে পাঠকমহলে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

সন্দীপ তার আত্মকথায় বলেছে,-"আমি নিজের লেখা আত্মজীবনী যখন পড়ে দেখি,তখন ভাবি এই কি সন্দীপ?আমি কি কথা দিয়ে তৈরি?আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোরা একখানা বই? তার এই কথাটার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় আপাতভাবে সন্দীপকে আমরা যা দেখি, সন্দীপ শুধু তাই নয়।তার মধ্যে আরো অনেক স্তর রয়েছে।যে মানুষ নিজের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন করে নিজেকে, নিজের বিবেকের কাছে,সে প্রতিদিনের ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় প্রতিনিয়ত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ভেতর দিয়ে নিজেকে নতুন করে গড়ছে। এই উপন্যাসে সন্দীপ এর চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখনই সন্দীপকে বিচার করি বা তার আচরণকে ব্যাখ্যা করি তখনই সব সময় নিখিলেশ কে তার পাশে রেখে,নিখিলেশের সঙ্গে তুলনা করে সন্দীপকে বিচার করি। এতে সন্দীপের চরিত্র অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়, সন্দীপ আমাদের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি কোনো পক্ষপাত লাভ করে না। কেননা নিখিলেশের চরিত্র উপন্যাসে অতি স্বচ্ছ অতি নির্মল। তারপাশে সন্দীপের চরিত্র অনেকটাই খাটো হয়ে যায়।এর পাশাপাশি এটাও সত্যি উপন্যাসে সন্দীপের ক্রিয়া-কলাপ, আচার-আচরণ এর ভিত্তিতে সন্দীপকে ভালো মানুষ হিসেবে গ্রহণ করতেও খানিক অসুবিধা হয়।এমনকি বিমলাও একসময়ে বলেছে- "সবচেয়ে আমার বিরক্ত লাগতো সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন।" সে বুঝেছিল সন্দীপ স্বদেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ নয়।"আমার কেবলই মনে হতো বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্ছে। কেননা ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরীবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে। অর্থাৎ সন্দীপ স্বচ্ছ নির্মল চরিত্রের একথা বলা যায় না।মূলত এই উপন্যাসটির ঘটনা আবর্তিত হয় সন্দীপকে কেন্দ্র করে। বিমলার

প্রতি তার আকর্ষণ এবং নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্যজীবনে সন্দীপের প্রভাব শুধুমাত্র তাদের পারিবারিক জীবনে ছায়া ফেলেনি,সন্দীপের স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি নিখিলেশের জমিদারি প্রজাদের উপরও প্রভাব ফেলেছে।

সন্দীপের আত্মকথা অংশগুলোতে তার স্বগতোক্তি থেকে বোঝা যায় দেশপ্রেম ও স্বদেশী আন্দোলনের আবরণে সে বারবার নিজস্ব প্রবৃত্তিকে পূরণ করতে চেয়েছে। বিমলা যে তার মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়েছে তাও সে বুঝেছে। তাই আত্মকথনে সে বলেছে-"আমার মক্ষীরাণী স্বপ্নের ঘোরেই চলেছে,সে জানে না কোন্ পথে চলেছে।সময় আসবার আগেই তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়"।

বন্ধু পত্নী সম্পর্কে একজন পুরুষের ধরনের মানসিকতা কখনোই একজন দেশপ্রেমিক স্বদেশীর হতে পারেনা।কিন্তু বন্ধু নিখিলেশ এর সঙ্গে দেশ সম্পর্কে যত মতপার্থক্য থাকুক একটা সময় নিখিলেশের বন্ধুত্বের বন্ধনে তার বিবেক দংশন হয়। আবার বিমলাকে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতাও তার নেই। তাই সে চেয়েছে স্বদেশের সঙ্গে বিমলাকে মিশিয়ে দিতে। ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারে ভারতবর্ষ যেমন অবগুণ্ঠনহীন হয়ে পড়েছে,বিমলাকেও সন্দীপ সেইভাবেই দেখতে চেয়েছে।

উপন্যাসে সন্দ্বীপের আত্মকথন এই তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরেছেন। স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ ছিল চরমপন্থী নেতাদের বিলাসিতা। পোশাকে-আশাকে ,কথায় বার্তায়,চালচলনে আদব কায়দায় তাদের মধ্যে সবসময় সাবেহিয়ানা ফুটে উঠত। সন্দীপ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই চরমপন্থী নেতাদের উগ্র জাতীয়তাবাদ,হিন্দুত্ববাদ,অন্ধ আবেগ,বিলাস পূর্ণ জীবন যাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন।স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের আবেগ সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সন্দীপ যেমন নিজের মুনাফা লুটতে চেয়েছিল সেইরকমই হিন্দুত্ববাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল যা প্রকৃতই বাংলা স্বদেশী আন্দোলন সফল হওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দেশপ্রেম এর তুলনায় প্রতারণা তারমধ্যে অনেক বেশি ছিল তা বোঝা যায় অমূল্য সঙ্গে মতবিরোধে। যে মুহূর্তে বিমলার আর কাছে অমূল্য তার থেকে বেশি প্রাধান্য পেতে থাকে সেই মুহুর্তেই অমূল্যর প্রতি সন্দীপের প্রতি হিংসা জেগে ওঠে। সে বিমলার কাছ থেকে টাকা আদায় করার পর তার সর্বস্ব গয়নাও দখল করতে চায়।কিন্তু সে কাজে অমূল্য বাধা দেওয়ায় সে রেগে যায়। নিখিলেশ ও বিমলার সামনে প্রকাশ্যে স্বীকার করে তার মোহের কথা-

"তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে---বন্দেমাতরং নয়,বন্দে প্রিয়াং বন্দে মোহিনীং,মা আমাদের রক্ষা করেন,প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন-বড় সুন্দর এই বিনাশ"।

একদিকে সুপ্ত হয়ে থাকা দেশপ্রেম অন্যদিকে বিমলার প্রতি আকর্ষণ এই দুয়ের মানসিক দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত সন্দীপের দেশপ্রেম জিতে যায়। হয়তো কিছুটা বাধ্য হয়েই সে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস এরকম বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।আসলে সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে লালসার স্থূলতা,অর্থ পিপাসী মানসিকতা,ভন্ড দেশপ্রেম যেমন রয়েছে তেমনি তার মধ্যে যদি শুধুই লোভ বা শয়তানি প্রবৃত্তি থাকতো তাহলে সে অনায়াসে বিমলা কে নিজের করে নিতই। কিন্তু তা সে করেনি। নিখিলেশের বন্ধুত্ব তার বিবেকে বার বার নাড়া দিয়েছে। সন্দীপের ব্যক্তিত্ব যেমন ছিল তেমনই তার মধ্যে কোনো সংস্কার ছিলনা। সন্দীপ হয়তো সত্যিই বিমানকে ভালবেসেছিল। কেননা সন্দীপ জীবনে এই প্রথম নারী কে দেখেছে তা নিশ্চয়ই নয়। এদেশের স্বদেশীর জোয়ারে হঠাৎ করে সন্দীপে শেষেই সম্মোহনী শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করেনি। সে বিমলা কে মক্ষীরানী বলেছে ঠিকই। কিন্তু একথা দেখে যদি আমরা আরেক দিক থেকে ভেবে দেখি তাহলে বলা যায় মৌচাকের অজস্র পুরুষ শ্রমিক মৌমাছির মতো নিজেকে গৌণ করে বিমলা কে প্রধান করে তুলেছে।এই দিক থেকে বলা যায় সন্দীপকে চেনার পথের মূল বাধা বোধহয় বিমলাই। ঘরে-বাইরে যেন এক স্বামী স্ত্রীর কলহের সমাধান মন্ত্র হিসেবে সন্দীপকে ব্যবহার করা হয়েছে।

বিমলার ছেলেবেলায় দেখা স্বপ্নের রাজপুত্তুরের সঙ্গে যখন নিখিলেশের কোন মিলই ঘটেনি তখন তার মন পাড়ি দিয়েছে গোপন আলোর অন্তঃপুরে। আর ঠিক সেই সময়ই স্বদেশী জোয়ারে ভেসে এসেছে সন্দীপ। যদিও প্রথমে বিমলার তার প্রতি কোন আকর্ষণ দেখা না গেলেও পরে কিন্তু সন্দীপের ভাষণ শুনে মোহ মুগ্ধ হয়েছে। যদিও সন্দীপের মধ্যে বাকচাতুর্য পরিপূর্ণভাবে ছিল তবুও বিমলা তার ভাষণের মধ্যে এক উজ্জ্বল দীপ্তি এবং আনন্দ খুঁজে পেয়েছিল। এর দায় যদি সন্দীপের খানিকটা হয় তবে কিছুটা দায় বিমলার অতৃপ্তিরও ছিল।

আবার সন্দীপ চলে যাওয়ার সময় সমস্ত মোহর ও গয়না ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। সে যদি সম্পূর্ণ অসৎ হত তবে কখনোই এমন কাজ করতে পারত না। যখনি সে বুঝেছে বিমলা তার প্রতি বিমুখ হয়েছে তখনই মোহর গয়না তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।আসলে তার মধ্যেও প্রেমের একটা সত্য অনুভূতি ছিল। তাই সে উচ্চারণ করেছে-"তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী"।

আসলে নিখিলেশের আদর্শের পাশাপাশি রক্তমাংসের সন্দীপের বাইরের অবয়বটিই প্রাধান্য পেয়েছে তার ভিতরের সন্দীপের খোঁজ বিমলা করেনি। বরণ সন্দীপ নিজেই চলে গিয়ে নিজেকে খাঁটি প্রমাণ করে গেছে।

৬.৪ মেজবউ রানী

মেজবউ রানীর চরিত্রকে উপন্যাসে দেখা যায় বিমলা এবং নিখিলেশের চোখ দিয়ে। চরিত্রটি প্রাণোজ্জ্বল,সজীব ও সরস। বিমলার আত্মকথা মধ্যে প্রথমদিকে চরিত্রটি যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তার চরিত্রের স্থুল দিকটিই চোখে পড়ে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিখিলের মন জুগিয়ে স্বাদেশিকতার ভান করা,টাকা বাড়ি সম্পর্কে বেশি মোহ প্রকাশ করা, বিমলার সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করা,দাসীদের নিয়ে আদিরসাত্মক হাস্য পরিহাস করা যার কোনটিই প্রশংসার যোগ্য নয়। তাই তাকে নিয়ে নিখিলেশ এর মত স্বামী সম্পর্কেও বিমলার মনে ভয় ছিল। কিন্তু এই সন্দেহমূলক উপন্যাসের শেষে তা উদঘাটিত হয়। বস্তুত পতিপ্রেম বঞ্চিতা অকাল বৈধব্য পীড়িতা এই রমণী ব্যর্থ জীবনের করুণ অশ্রুকে গোপন করতে গিয়ে হাসি-ঠাট্টায় উচ্ছল হয়ে উঠেছে। অন্তর্গত বেদনা উদঘাটিত হয়েছে বাল্য স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে। ছয় বছরের দেবরের সঙ্গে ন

বছরের বালিকা বধূর পৃথিবীতে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তারি প্রকাশ ঘটেছে তার নানা আচরণে। তাই নিখিলেশের খেয়ালী কাজ, তার স্বাদেশিকতা,তার ব্যথা বেদনা সবকিছুতেই মেজোরানী তারসঙ্গে থেকেছে। সব সময় এক কল্যাণময় দৃষ্টির ছায়া দিয়ে নিখিলেশের সংসারকে সে ঢেকে রেখেছে। নিখিলেশ যখন সব হারিয়ে রিক্ত উদাসীন বোধ করেছে তখন স্নেহের এক অনাবিল ফল্গুধারার সন্ধান পেয়েছে মেজোরানীর মধ্যে। এ প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা গ্রন্থে বলেছেন----

"নিখিলেশের প্রতি তাহার (মেজবউরানীর) যে স্নেহ সেই স্নেহের সঙ্গে একটু দেহ লালসা খাদও যে মেশানো ছিল তা অস্বীকার করা চলে না। দ্বিতীয় স্তরে মেজোরানীর ঈর্ষা হইয়াছে দেবরের প্রতি প্রীতিপূর্ণ শঙ্কায় ও সহানুভূতিতে। দেহ লালসা বিবর্তিত হইয়াছে সস্নেহ যত্ন,সেবা ও আশ্রয় রচনায়"।

মেজোরানী নিখিলেশ কে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছে। সে বলেছে---"আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো"। অন্যদিক থেকেও উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে মেজোরানীর উপস্থিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। বিমল আর চাঞ্চল্যের রাশ টেনে ধরার জন্য তার প্রয়োজন ছিল। মাঝে মাঝে সে বিমলা কে সতর্ক করেছে।কখনো তার সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এ, কখনো বা কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্যে, কখনো বা নানা ছলনায়। কিন্তু তারচেয়েও বড় কথা এইগুলি বিমলার চরিত্র পরিবর্তনে একান্ত অপরিহার্য ছিল। এছাড়াও মেজোরানী যেন "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে নিখিলেশ ও বিমলার পারিবারিক জীবনকে একটা পূর্ণতা দান করেছে। এই দিক থেকেও তার চরিত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৬.৫ চন্দ্রনাথ বাবু

উপন্যাসের মূল গত তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে প্রধান তিনটি চরিত্রে কোন একজন কেউ একেবারে অবান্তর বলা চলে না। নিখিলেশের বাল্যকালের শিক্ষক চন্দ্রনাথ বাবু তার মানবতার আদর্শ এবং প্রেরণা। এই সৌম্য দর্শন বৃদ্ধ মানুষটি বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় অদ্বিতীয়। তার যুক্তিকে সহজে খন্ডন করার সাধ্য কারো থাকে না। তার রাজনীতি বোধও দৃঢ় মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিকে তিনি নিখিলেশের সংসারের প্রতি সর্বদা কল্যান দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। অন্যদিকে যখনই নিখিলেশ এর মধ্যে আদর্শ সম্পর্কে সামান্য অবসাদ এসেছে তখনই তার সশরীর উপস্থিতি বা প্রেরণা নিখিলেশ কে তার আদর্শ পথে ফিরিয়ে এনেছে। বিমলার বিচিত্র

মানসিকতার মধ্যেও নয় শক্তি সঞ্চার করে তাকে সুস্থ করবার চেষ্টা করেছেকরেছেন।বিমলার উক্তিতে---" মাস্টারমহাশয়ের একটা শক্তি আছে। তিনি মনটাকে এমন একটা শিখরের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যেখান থেকে নিজের জীবনের পরিধি টাকে এক মুহূর্তে বড় করে দেখতে পাই"। নিজের জীবনেও তিনি মেনে চলেন এক আদর্শবোধ কে। নিখিলেশের আত্মকথাতেই তার ভোগ বিলাসী জীবন-যাপন অসহায় দরিদ্র মানুষকে শিক্ষকতায় নিষ্ঠাবান চরিত্রটিকে এক মহান আদর্শপূর্ণ করে তুলেছে।

কিন্তু উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে যে ধরনের সক্রিয় থাকা প্রয়োজন তা চন্দ্রনাথ বাবুর মধ্যে একান্তই অনুপস্থিত। তাই উপন্যাসের মধ্যে দুটি জায়গায় তার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক সংকট মুহূর্তে তার হঠাৎ আবির্ভাব সংকট এড়াতে সাহায্য করলেও তারা সজ্ঞান দায়িত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। উপন্যাস কাহিনীতে তিনি প্রথম সচেতন সহায়তা করেছেন পঞ্চুকে এবং পঞ্চুর সাজানো মামীকে বিতাড়িত করে পঞ্চুকে ন্যায্য দাবি ফিরিয়ে দিতে। অবশ্য এর পেছনে ছিল তার অন্তর্নিহিত মনুষ্য ধর্ম। চন্দ্রনাথ বাবুর সক্রিয়তার দ্বিতীয় নিদর্শন উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্তে দাঙ্গার খবর আনা এবং নিবারণের জন্য যেতে বলা। এ ব্যাপারে তিনি মূর্তিমান আদর্শ। এই সময় ছাত্রের করলেন অপেক্ষা তার কর্তব্য ধর্মকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এই কারনেই তিনি এই উপন্যাসের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছেন।

৬.৬ অমূল্যচরণ

ঘরে বাইরে উপন্যাসে অমূল্যচরণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদের উন্মাদনায় রুদ্র পন্থার বিরুদ্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেও বিপ্লবীদের আদর্শ নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম কে শ্রদ্ধা করেছেন। বিমলা নিখিলেশ সন্দীপের আত্মকথার মধ্য দিয়ে অগ্নিযুগের কিছু স্ফুলিঙ্গ আমরা দেখতে পাই। এরকম একটি স্ফুলিঙ্গ হলো অমূল্যচরণ। দেশপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ এই চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। অমূল্যচরণ এর মত আদর্শ দেশপ্রেমিক এর সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের মধ্যে নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। তাদের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথকে অমূল্যচরণ এর চরিত্র প্রণোদিত করেছিল।কিন্তু স্বদেশীযুগে দেশপ্রেমের নামে যারা উন্মাদনা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল তাদের কর্মকান্ড রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। সন্দীপ এদেরই প্রতীক। দেশপ্রেম এর নামে মানুষকে মুগ্ধতায় ও স্তাবকতার ভুলপথে চালিত করতে। বিমলা সন্দীপের ছলনায় মুগ্ধ হয়েছে। দেশ প্রেমের নামে সন্দীপের উন্মাদনার পথে পা বাড়িয়েছে। সন্দীপ বিমলা অমূল্যচরণ কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগের একটি বিশ্বস্ত ছবি নির্মাণ করেছেন। বিলিতি দ্রব্য বর্জন

বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে ফেলা ইত্যাদির সঙ্গে স্বদেশী ডাকাতি কাছারি লুটের মত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে চরিত্রগুলি জড়িত। অমূল্য সন্দীপের বিশ্বস্ত অনুচর ও সহযোগী। আবার সেই বিমলারও বিশেষ প্রিয় পাত্র। সন্দীপ বিমলা অমূল্য এই তিন ধরনের চরিত্রের কার্যকলাপ দেশপ্রেমের নামে উত্তেজনা ও ধ্বংসাত্মক দিকটিই প্রবল হয়ে উঠেছে। কোন গঠন মূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়নি। নিখিলেশের কাছারিতে ছয় হাজার টাকা লুঠ অভিমান আর গয়না বিক্রির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সন্দীপ নেপথ্যে থেকে বিমালার সহায়তায় অমূল্যকে দিয়ে এসব কাজ করিয়ে নিয়েছে এবং সেইসঙ্গে সে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। কিন্তু অমূল্য নিজের কোনো স্বার্থ নয় দেশপ্রেমিক প্রেরণায় তাড়িত হয়ে এ ধরনের কাজ করেছে তার কাজ নিশ্চয়ই স্বদেশী যুগে চরমপন্থাকে স্মরণ করার। এজাতীয় আত্মবিনাশী কার্যকলাপ ও রুদ্রপন্থায় রবীন্দ্রনাথের কোনদিন সমর্থন ছিল না। কিন্তু অমূল্যর আত্মোৎসর্গ ও আদর্শনিষ্ঠ কারণে সে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। উপন্যাসের শেষের দিকে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধলে দিলে তা প্রতিরোধ করতে নিখিলেশ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ছুটে যায়। সন্দীপ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায়। আর অমূল্য আত্মোৎসর্গের দ্বারা দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

ঘরে বাইরে উপন্যাসের বিমলা চরিত্রের দুই প্রান্তে দুইজন পুরুষ কে রেখে তার অন্তর জীবন ও নারীসত্তার টানাপোড়েন রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। সন্দীপের মোহময় শক্তির কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছে এবং স্বামীর কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে। কিন্তু বিমালা একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং সন্দীপের সর্বগ্রাসী মোহ লালসা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনে। আত্মোপলব্ধি স্তরে স্তরে বিমলার উত্তরণ ঘটে। বিমলার জীবনেরই উত্তরণে বিশেষ সাহায্য করেছে অমূল্য। এই কারণে বিমালার আত্মকথা তেই অমূল্যের চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। সন্দীপের কাছে অবশ্য অমূল্য কোন গুরুত্ব পায় না। সে বিমলাকে বলে ওই বালক আমার ছায়ার ছায়া,আমার প্রতিধ্বনি। আমার পাশ থেকে সরে গেলে ও কিছুই নয়"। কিন্তু সন্দীপকে ছাড়াও যে অমূল্য অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিমলার ফেরত পাওয়া গয়নার বাক্সে দাবি তুললেন অমূল্য তখন হিংস্র জন্তুর মত দিকে তাকিয়ে গুমড়ে গুমড়ে বলে---"দেখুন সন্দীপবাবু, আপনি জানেন আমি ফাঁসিকে ভয় করিনে।এ গয়নার বাক্স যদি আপনি নেন..."। অমূল্য যে সন্দীপের শুধুমাত্র ছায়া বা প্রতিধ্বনি নয় উপরোক্ত অসম্পূর্ন বাক্য তেই তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. ঘরে বাইরে উপন্যাসে অতি সংক্ষেপে নিখিলেশ চরিত্রের পরিচয় দাও।

উত্তর-ঘরে বাইরে উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশ। রবীন্দ্রনাথের মানব চেতনার দিকটি সঙ্গে খানিকটা মিলে যায় নিখিলেশ। উপন্যাসের সত্য কল্যান ও সুন্দরের প্রতিমূর্তি হল নিখিলেশ। নিখিলেশের অবস্থান পারিবারিক জীবন পটভূমিতে,রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুতে।

২. ঘরে বাইরে উপন্যাসে নায়িকা বিমলা পূর্বের অন্যান্য উপন্যাস গুলির তুলনায় স্বতন্ত্র কেন?

উত্তর-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নায়িকা বিমলা। ইতোপূর্বে সৃষ্ট বাংলা উপন্যাসের নায়িকাদের তুলনায় বিমলা বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্যের নায়িকারা এর পূর্বে চিরাচরিত কিছু সংস্কার এবং সতীত্বের মিথ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিমলা তা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে গেছে। একদিকে প্রবৃত্তির অমোঘ টান অন্যদিকে সংস্কারের দ্বন্দ্বে নায়িকারা এতদিন পর্যন্ত সামাজিকতা ও নৈতিকতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে শেষ অব্দি সংস্কারকেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু বিমলা স্বামীর সামনেই স্বামীগৃহে বাস করে স্বামীর বন্ধু সন্দীপ এর প্রতি আকর্ষণ ও প্রবৃত্তির টানে স্বামীর সাথে মানসিক ব্যবধান গড়ে তুলেছে। সমাজ, সংস্কার, নৈতিকতা তাকে বিচলিত করেনি। তাই বিমলা বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিক ছক থেকে বেরিয়ে আসা,মৌলিক এবং সাহসী একটি চরিত্র।

৩. ঘরে বাইরে উপন্যাসে সন্দীপ চরিত্রটিকে কি খাঁটি বলা যায়?দু-চার কথায় লেখ।

উত্তর-সন্দীপ চলে যাওয়ার সময় সমস্ত মোহর ও গয়না ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। সে যদি সম্পূর্ণ অসৎ হত তবে কখনোই এমন কাজ করতে পারত না। যখনি সে বুঝেছে বিমলা তার প্রতি বিমুখ হয়েছে তখনই মোহর গয়না তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।আসলে তার মধ্যেও প্রেমের একটা সত্য অনুভূতি ছিল। তাই সে উচ্চারণ করেছে--- "তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী"।

আসলে নিখিলেশের আদর্শের পাশাপাশি রক্তমাংসের সন্দীপের বাইরের অবয়বটিই প্রাধান্য পেয়েছে তার ভিতরের সন্দীপের খোঁজ বিমলা করেনি। বরণ সন্দীপ নিজেই চলে গিয়ে নিজেকে খাঁটি প্রমাণ করে গেছে।

৪. ঘরে বাইরে উপন্যাসের চন্দ্রনাথ বাবুর পরিচয় দাও।

মন্তব্য

উত্তর-নিখিলেশের বাল্যকালের শিক্ষক চন্দ্রনাথ বাবু তার মানবতার আদর্শ এবং প্রেরণা। এই সৌম্য দর্শন বৃদ্ধ মানুষটি বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় অদ্বিতীয়। তার যুক্তিকে সহজে খন্ডন করার সাধ্য কারো থাকে না। তার রাজনীতি বোধও দৃঢ় মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিকে তিনি নিখিলেশের সংসারের প্রতি সর্বদা কল্যান দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। অন্যদিকে যখনই নিখিলেশ এর মধ্যে আদর্শ সম্পর্কে সামান্য অবসাদ এসেছে তখনই তার সশরীর উপস্থিতি বা প্রেরণা নিখিলেশ কে তার আদর্শ পথে ফিরিয়ে এনেছেন।

৬.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঘরে বাইরে উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিনায়ক সন্দীপ- বিচার করো।

২. ঘরে বাইরে উপন্যাসে পার্শ্ব চরিত্র গুলির ভূমিকা আলোচনা করো।

৩. রবীন্দ্রনাথের পূর্ব উপন্যাস গুলির নায়িকার তুলনায় বিমলা একেবারে স্বতন্ত্র এক নায়িকা আলোচনা করো।

৪. ঘরে বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশ এবং সন্দীপ এর মধ্যে নায়ক কে?-উপযুক্ত কারণ সহ বুঝিয়ে দাও।

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সুকুমার সেন।

২. ঘরে-বাইরে- ড.গোকুলানন্দ মিশ্র।

৩. রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা সত্যব্রত দে

৪. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫.বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা- শ্রী ভূদেব চৌধুরী

৬. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস- অমরেশ দাস

৭.উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি- উজ্জ্বল কুমার মজুমদার

একক ৭ ঘরে বাইরে উপন্যাসের রাজনৈতিক সত্য

বিন্যাসক্রম

৭.১ উপন্যাসের রাজনৈতিক সত্য ও প্রেমের সত্য একই সূত্রে গাঁথা

৭.২ নামকরণ

৭.৩ উপন্যাসের প্রেম চেতনা

৭.৪ বিমলার মনস্তত্ত্ব

৭.৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ উপন্যাসের রাজনৈতিক সত্য ও প্রেমের সত্য একই সূত্রে গাঁথা

"ঘরে বাইরে" উপন্যাসের কাহিনী এক বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিতে বিবৃত হয়েছে। এর মূল কাহিনী অবশ্যই নিখিলেশ বিমলা আর সন্দীপের সম্পর্ক এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের ঘটনা। কিন্তু ব্যক্তি জীবনের এই সমস্যা সমকালীন রাজনৈতিক দেশ জীবনের পটভূমিতে স্থাপিত হয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত বিশ শতকের প্রথমদিকের বঙ্গদেশ পটভূমি। লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে দেশজুড়ে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের একদিকে ছিল স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রচার অন্যদিকে বিদেশি পণ্য বর্জন বা বয়কট। এছাড়া চরমপন্থী নেতাদের বাগ্মিতা পিকেটিং এর নামে মাঝেমাঝে অগ্নিসংযোগ স্বদেশী ডাকাতি শক্তিরুপে দেশমাতৃকার মূর্তিপূজা মৌলবীদের প্ররোচনা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ইত্যাদি হয়ে উঠেছিল আন্দোলনের অঙ্গ। ঘরে বাইরে উপন্যাসে এর বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শুধু রাজনৈতিক চিত্রের নিখুঁত প্রতিফলন নয় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভিন্নমুখী তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে আন্দোলন সংক্রান্ত মত রবীন্দ্র ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

উপন্যাসে রবীন্দ্র ভাবনার ধারক নিখিলেশ এবং তার শিক্ষক চন্দ্রনাথ বাবু। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী ভাবনায় উদ্ভূত হলেও উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন। আবেদন-নিবেদন বা দয়া ভিক্ষা তেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। আত্মোপলব্ধি উদ্বোধনের দ্বারা যতদিন দেশবাসী আপন অধিকার অর্জনের যোগ্য না হয়ে উঠবে ততদিন তাদের আবেদন নিষ্ফল হতে বাধ্য বলে তিনি মনে করতেন। গ্রাম কে কেন্দ্র করে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মপন্থার মধ্য দিয়ে এই আত্মনির্ভরশীল আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটবে ধ্বংসাত্মক রুদ্র পন্থায় নয়। তাই স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার তিনি সমর্থন করেন কিন্তু বয়কট আন্দোলনের নামে দরিদ্র জনসাধারণের ওপর অত্যাচার বা জোর-জুলুম তিনি সমর্থন করতে পারেননি। দেশকে কোন বিশেষ মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে পুজো করার সংকীর্ণতাকে ও তিনি সমর্থন করেননি। দেশপ্রেমের এই ভাবনারই ধারক নিখিলেশ। সন্দীপের সুবিধাবাদী আত্মসর্বস্ব বস্তুতান্ত্রিক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী চেতনায় নিখিলেশ বিশ্বাস করেনি। কেননা সন্দীপের দেশসেবা পূর্বাপর হিতাহিত বিবেচনা রহিত নেশার মত। যেন করা এক নেশার উত্তেজনায় সে দেশের সেবায় উন্মত্ত প্রায় হয়েছে। কিন্তু মোহ বা আচ্ছন্ন বা নেশা মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে সত্য কে সে দেখতে পায় না।তাই দেশের জন্য ত্যাগ না করে সন্দীপ দেশের জনগণের উপর উপদ্রব ককরে । নিখিলেশ মনে করে দেশকে সেবা করতে হলে আগে দেশকে এবং দেশের মানুষকে জানতে হবে এবং তাদের ভালোবাসতে হবে। আর সন্দীপের দেশপ্রেম খন্ডিত মুসলমান মানুষজন সেখানে উপেক্ষিত। এর ফল ভয়াবহ হতে বাধ্য।দাঙ্গা তার প্রমাণ। সন্দীপ দেশসেবার নামে মানুষের ধর্ম কে ভুলেছে। নিখিলেশ এর মত এই দেশের ওপর শাশ্বত ধর্মের অধিষ্ঠান। সে বলে----"দেশের ওপরও যারা ধর্মকে মানছে না আমি বলছি তারা দেশকে মানছে না"। সন্দীপ জোরের সঙ্গে লুঠ করে কেড়ে নিয়ে আজকের দিনের ফল টা ভোগ করতে চায়। আর নিখিলেশ বলে---"আমি কালকের দিনের ফলটা চাই। সেই ফলটাই সকলের"।এই ফলের মধ্যেই রয়েছে দেশের কল্যাণ,সত্যতা।

৭.২ নামকরণ

শেক্সপীয়র বলেছিলেন"whats in a name?" গোপালকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। মানুষটি যেমন তেমনি থাকে। কিন্তু তবুও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণের একটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ নামকরণের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা পাঠকের জন্মায় এবং লেখক এর অভিপ্রায় টি সম্পর্কেও একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। উপন্যাসিক কে তাঁর রচনার নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সচেতনতা অবলম্বন করতে হয় এবং একটি রচনার নামকরণের সার্থকতা এবং ব্যর্থতার উপর রচনাটির সার্থকতা ব্যর্থতা অনেকটা নির্ভরশীল।

কোন উপন্যাস নাটক গল্প বা কবিতার ক্ষেত্রে নামকরণ থেকে রচনাটির বিষয়বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে পাঠক মহল একটা আভাস পেয়ে থাকে। সাধারণত আমরা বিষয়টির ঘটনা চরিত্র বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামকরণের সংগতি সাধন করে থাকি। নামকরণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রচনা কারও এই বিষয় গুলোর উপরে বিশেষ দিকপাত করে থাকেন। নামকরণ যে যে দিককে কেন্দ্র করে হতে পারে সেগুলো হলো----

প্রথমত, ঘটনা বা বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক। দ্বিতীয়তঃ চরিত্র কেন্দ্রিক। তৃতীয়তঃ পরিবেশ পরিস্থিতি ও পটভূমি কেন্দ্রিক। চতুর্থত ব্যঞ্জনা ধর্মী বা প্রতীক ধর্মী বা সাংকেতিক। আলোচনার মাধ্যমে দেখে নেওয়া যেতে পারে উপন্যাসটির কোন দিকটিকে কেন্দ্র করে লেখক নামকরণ করেছেন এবং তা আদৌ সার্থক হয়েছে কিনা।

প্রথমে উপন্যাসে চরিত্রগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় নায়িকা বিমলা, নায়ক নিখিলেশ ও প্রতিনায়ক সন্দীপকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের নামকরণ হয়নি। শুধু মূল চরিত্রই নয় গৌণ চরিত্রগুলিকেও নামকরণের ক্ষেত্রে লেখক বিশেষ গুরুত্ব দেননি।

একইভাবে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ঘটনা বা পরিবেশ-পরিস্থিতি পটভূমি কোনটিই নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি।

অতএব স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় লেখক উপন্যাসটির ব্যঞ্জনাধর্মী বা প্রতীক ধর্মী নামকরণ করেছেন। তবে সে নামকরন সার্থক হয়েছে কিনা তা আলোচ্য বিষয়।

উপন্যাসটির নায়িকা বিমলা সুগৃহিনী ঘোর সংসারী পতিভক্তি পরায়না হওয়া সত্বেও স্বামী নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপের প্রতি মোহ আকৃষ্ট হয়েছে এবং স্বামী নিখিলেশের থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে।তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে ব্যবধান।সন্দীপের আগমনের পর বিমলার মনে হয়েছে বাহিরই তার স্থান। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের ইচ্ছেয় এবং বাইরে নিজেকে খুঁজে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বিমলার মনে হল সেটাই বোধহয় তার জীবনের সঠিক পথ। কিন্তু যখন সন্দীপের আসল চেহারা, লোভ,লালসা অর্থ পিপাসি সন্দীপ কে সে দেখল তখন সে বুঝল 'বাহির' তার স্হান নয়।বরং অন্যান্য নারীদের মতোই বাড়ির অন্দরমহলেই তার স্থান।রবীন্দ্রনাথ বিমলার এই ঘরে এবং বাইরের আকর্ষণ বিকর্ষণ এর মধ্যে দিয়েই একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। বোঝা যায় উপন্যাসটির নামকরণ ব্যঞ্জনা ধর্মীই হয়েছে।ঘরে বাইরে উপন্যাসটি স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পটভূমি কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। পাশাপাশি বিবাহিত নারী এবং বিবাহিত পুরুষের হৃদয়ের রহস্য উম্মেলনের একটা প্রয়াসও রবীন্দ্রনাথ করেছেন। সেই সময় ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার নতুন তরঙ্গ ভারতীয় মানুষের জীবনধারায় ক্রমশ প্রবেশ করছিল তার পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। সে কারণেই চন্দ্রনাথ বাবু বলেন----"বিদেশ থেকে একি পাপের মহামারী আমাদের দেশে প্রবেশ করল"। শিক্ষিত গৃহস্থ ঘরে নতুন আধুনিক আন্দোলন এসে প্রবেশ করায় বিমলার মত অন্তঃপুরচারিণীকেও বহির্জগতের পা রাখার আকাঙ্ক্ষা দিয়েছে। শুধু তাই নয় নিখিলেশও বিমলাকে ঘরের মধ্যে পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। নিখিলেশ বলেছে----"আমি চাই,বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও,আমি তোমাকে পাই।এখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকী আছে"। নিখিলেশের উক্তিটি উপন্যাসে অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে বিমলা নিখিলেশকে নয়, সন্দীপ কে খুঁজে নিয়েছে। যদিও এই খুঁজে নেওয়ার দুটি স্তর রয়েছে। আর সন্দীপও বাইরে বন্ধুপত্নী বিমলা কে পেয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হয়নি। উপন্যাসিক বলেছেন---

"যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশ লক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই এই বিমলার মুখে বধূর ঘোমটা খুলবে---সে অনাবরনে তার অগৌরব থাকবেনা। এই উক্তিতেই নিহিত আছে উপন্যাসের নামকরণের তাৎপর্য।

"পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি" তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন----- "আজকাল পাশ্চাত্য সমাজে শুনতে পাচ্ছি নারী বলছে 'আমি মায়ার আবরণ রাখবো না।পুরুষের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেব...এতদিন যাকে বলে এসেছি লজ্জা,যাকে বলে এসেছি শ্রী,আজ তাতে আমার পরাভব

ঘটেছে;সেসব বাধা বর্জন করব। পুরুষের চালে তার সমান তালে পা ফেলে আমরা তার সমান রাস্তায় চলব' "। ঘর ও বাইরের টানাপোড়েন এবং এই দুই এর ব্যবধান যে আস্তে আস্তে কমে আসছিল এই উক্তিতে তা আরো স্পষ্ট হয়। আসলে নারী গৃহলক্ষী। সে যদি গৃহের বন্ধন ছেড়ে বাইরের জগতের মোহজাল এর বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে নিজেকে তবে তা কখনই শুভ হয় না।উপন্যাসের চরিত্রসমূহ এবং ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করলে ঘরে বাইরে উপন্যাসের মধ্যে থেকে এই তত্ত্বই উঠে আসে।

নিখিলেশ বিমলা সন্দীপ এরা নিজেদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের তাড়নায় জীবনের পথে এগিয়ে গেছে।কারো ক্ষেত্রে কখনো সেই পথ ভুল হয়েছে, আবার কেউ নিজেদের পথে অবিচল থেকে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। নিখিলেশ চেয়েছিল বিমলা কেবল গৃহবন্দী হয়ে না থেকে বাইরের জগতে এসে নিখিলেশ কে চিনে নিক,সেখানেই তাদের ভালোবাসার আদান প্রদান হোক।নিখিলেশ বলেছে----

"এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে। তুমি যে কাকে চাও জানো না, কাকে পেয়েছ তাও জানোনা।...তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্য তুমিও হও নি, আমিও হইনি।সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।"কিন্তু বাইরের জগতে পা রেখে বিমলা ক্রমশ নিখিলেশের থেকে দূরে সরে গেছে এবং সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার কাছাকাছি পৌঁছতে চেয়েছে।সন্দীপের প্রচন্ড দেশপ্রেম, স্বদেশী আন্দোলনের অদম্য উৎসাহ এবং তার বাকচাতুর্য তার প্রতি মোহগ্রস্ত করে তুলেছে। সন্দীপের প্রতি আকর্ষণ বিমলার যত বেড়েছে ততই সন্দীপের পাশে নিখিলেশকে তার ম্লান মনে হয়েছে।নিখিলেশ বিমলার ওপরে কখনো কোন বিষয়ে জোর ফলায় নি। কারণ তা নিখিলেশের আদর্শ বিরোধী। নিখিলেশ বিশ্বাস করে---

"আস্ত পাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো।নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানো টাও ভালো।"

কিন্তু নিখিলেশের এসব কথার গভীরতা বিমলা বোঝেনা, এমনকি এসব কথা বোঝবার ধৈর্যও তার নেই। কিন্তু বিমালা কে ঘর থেকে বাইরে বের করে আন বার একটানে সাজানো নিখিলেশ কে পেয়ে বসেছিল। তার মতে---"মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্ত রূপে সত্যরূপেই

দেখতে চাই,তাহলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিন্ত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়"। বিমলার অন্তরের টান ছিল প্রচন্ডতার ওপর।তাই সন্দীপের প্রতি আকর্ষণ তার গভীর হয়েছে। তবে বিমলার মন যে পরিবর্তিত হচ্ছে তা নিখিলেশ সন্দীপ বড় জা মেজ জা সকলেই বুঝতে পারছিল।

তবে বিমলার এই মোহ কাটতে বেশি সময় লাগেনি। সঠিক সময় উপন্যাসে চন্দ্রনাথবাবু এবং অমূল্য উপস্থিত হয়ে বিমলা কে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছে। সন্দীপের ডাকে বিমলা ছুটে এসেছিল দেশের কাজ করার জন্য। আত্মসমর্পণের জন্য সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ছিল। সে জানিয়েছে---"আমি আলো দেব,আমি অমৃত দেব,সেই বিশ্বাসে,সেই আনন্দে দু'কূল ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিলুম"। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সন্দীপের সত্য তার সামনে প্রকাশিত হলো। সন্দীপের ভন্ড দেশপ্রেম লালসা তীব্রতা চিত্তচাঞ্চল্য এগুলোই তার সত্য রূপ। মানসিকভাবে বিমালা আঘাত পেল। এই পর্যায়ে সে নিখিলেশের সত্য ভালবাসা উপলব্ধি করল এবং তার সত্য ভালোবাসার কাছাকাছি পৌঁছতে চাইল। এসময় বিমলা বলে----

"আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম, সে গান শুনে স্বর্গ থেকে ধুলোয় নেমে এসেছিলুম, সেই কি এই ধুলোকে স্বর্গ করবার জন্যে নয়?সেকি স্বর্গকেই মাটি করবার জন্যে ?"। বাইরে সম্পর্কে বিমলার মনে যে আকর্ষণ ছিল তা ক্রমশ মিলিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছিলেন ছিলেন পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতীয় রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে প্রবেশ করলে তার কী প্রভাব পারিবারিক জীবনে পড়তে পারে। ঘর ও বাহির এর পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরকালের আর নারী পুরুষের দ্বন্দ্ব যেন এর সাথে খুব স্বাভাবিকভাবেই জুড়ে যায়।তার ফলে পারিবারিক জীবনে পুরুষ এবং নারীর ভূমিকা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় এবং পরিবার ও সমাজ কোন পথে চালিত হবে তা নিয়েও সংশয় দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে ঘরের কথা, বাইরের কথা যেমন একদিকে বলেছেন, তেমন আরেকদিকে ঘরের প্রভাব বাইরের উপর ও বাইরের প্রভাব ঘরের উপর কিভাবে পড়তে পারে তাও চরিত্র গুলির মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন। আর উপন্যাসটি একটি গভীর ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছে আমাদের সামনে।সেই কারণেই উপন্যাসের ব্যঞ্জনা ধর্মী নামকরণ 'ঘরে বাইরে' একেবারেই সার্থক হয়ে ওঠে।

৭.৩ ঘরে বাইরে উপন্যাসের প্রেম চেতনা

দাম্পত্য প্রেম,স্বদেশ প্রেম এবং আত্মপ্রেম---ঘরে বাইরে উপন্যাসের প্রেম চেতনাকে এই তিন দিক থেকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে । আত্মকথন রীতিতে, বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, সমাজ ও জীবনের,দেশ ও কালের প্রবাহে, নর-নারীর দুর্জ্ঞেয় হৃদয় রহস্যের উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে উপন্যাসটি রচনা করেছেন। ঘরে-বাইরে এর প্রেক্ষাপট স্বদেশী আন্দোলনের উত্তরকাল। নায়ক নিখিলেশ জমিদার তবে প্রজাহিতৈষী,আদর্শবাদী উদারমনস্ক। নিখিলেশ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি মানব ধর্মের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। নিখিলেশ এর স্ত্রী বিমলা স্বামী ভক্তিতে পরিপূর্ণ।নিখিলেশ এর প্রতি সে তার অর্ঘ্য নিবেদন করতে চেয়েছে। কিন্তু নিখিলেশ স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকারে বিশ্বাসী। তাই বিমালা কে সাজসজ্জার উপকরণ দাস দাসী পছন্দসই জিনিসপত্র উপহার দেওয়া থেকে শুরু করে তার শিক্ষা চর্চার ব্যবস্থা করা সবটাই নিখিলেশ করেছে।নিখিলেশ বারবার বিমলাকে বলেছে ‘স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে, তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকবো, আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী!’ — সেই প্রেমের প্রশ্নেই জীবনে তীব্র সংকটের মুখোমুখি হয়েছে সে।শুধু তাই নয় নিখিলেশ বিমলাকে ঘরের মধ্যে পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। নিখিলেশ বলেছে----"আমি চাই,বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও,আমি তোমাকে পাই।এখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকী আছে" ।নিখিলেশ চেয়েছিল বিমলা কেবল গৃহবন্দি হয়ে না থেকে বাইরের জগতে এসে নিখিলেশ কে চিনে নিক,সেখানেই তাদের ভালোবাসার আদান প্রদান হোক।নিখিলেশ বলেছে----

"এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে। তুমি যে কাকে চাও জানো না, কাকে পেয়েছ তাও জানোনা।...তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্য তুমিও হও নি, আমিও হইনি।সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে" ।নিখিলেশ প্রেমের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদার ছিল এবং ছিল সহিষ্ণু। তার একটা নিজস্ব আদর্শ ছিল। যে আদর্শের আঁচ হয়তো স্বয়ং লেখক এর থেকেই নিখিলেশ পেয়েছিল। তাই আদর্শবাদী নিখিলেশ কক্ষনোই জোর করে স্বামীর অধিকার স্ত্রীর ওপর ফলাতে চায়নি। তার প্রেমের সত্যতা উপন্যাসের শেষে বিমলা নিজেই উপলব্ধি করেছে। হয়তো অনেক সময়

নিখিলেশ বিমলার প্রতি উদাসীন থেকেছে। কিন্তু আসলে তা জানো উদাসীনতা নয় তার উদারতা। তাই যখন নিখিলেশ বুঝেছে বিমালার মন পরিবর্তিত হচ্ছে এবং সন্দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছতে চাইছে তখনো সে তার স্বভাবসিদ্ধ ভাবি নিশ্চুপ নির্বিকার থেকেছে। সেই সঙ্গে নিজের সত্যের কাছে নিজের আদর্শের পথে অবিচল থেকেছে। তার জন্যই হয়তো শেষ পর্যন্ত তারপর প্রেম জয়লাভ করেছে।

এরপর বিমলার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে বিমলা স্বামী ভক্তি পরায়ণা। উপন্যাসের প্রথমে বিমলার আত্মকথায় তাকে সাধারণ বাঙালি তথা ভারতীয় নারীর মত স্বামী ভক্তি পরায়ন হিসেবেই দেখা যায়। স্বামীকে ভক্তি করা,পুজো করা তার কাছে একটা সংস্কার। তাই স্বামীর ফটোতে ওর চিঠিতে সে ফুল দিয়ে পুজো করেছে----

"একটি চন্দন কাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তার চিঠিগুলো রাখতুম, আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম"। বিমলার আত্মকথায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তার এই ভক্তির কথা। কখনো সে বলেছে---"মেয়ে মানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও এমনি সহজ কথা।" আবার কখনো সে বলেছে---- "আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল সে ভক্তি করবার ব্যগ্রতা"। আসলে ভক্তির এই সুর সে লাভ করেছিল তার মায়ের থেকেই। কিন্তু প্রকৃত প্রেম সেখানে ছিল না। বিমলা কেবল এই ভক্তি কে প্রেম বলে জেনেছে ও মেনেছে।

আর তার এই ভক্তি থেকেই তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল সতীত্বের অহংকার। বিমলা নিজেই সে কথা স্বীকার করেছে---

"তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের।সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে, এটা আমার মনে ছিল"। তবু মেজো জায়ের প্রতি তার মন সন্দিগ্ধ হয়েছে।

নিখিলেশের জীবন দর্শন ছিল বিমলার বোধগম্যের বাইরে। তাই বল প্রয়োগে,জোরজবরদস্তিতে বিশ্বাসহীন,মুক্তচিত্ত,উদার নিখিলেশ বিমলার চোখে ছিল পৌরুষের তেজহীন পুরুষ। বিমলা নিজে সেই কথা স্বীকার করেছে----

"সত্য কথা বলব?অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি,আর--- একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।" "আমার মনে হতো, ভালো হবার একটা সীমা আছে,যেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়।"

আসলে বিমলার মনে যে রাজপুত্তুরের স্বপ্ন ছিল নিখিলেশের মধ্যে দিয়ে সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি বিমলার। সে জানিয়েছে---

"ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে-সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাগ্র মনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মতো, যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন-কি, তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় না হয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখতে পেলুম না কেন"?

আর এই না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তার মন সন্দীপের দিকে ধাবিত হয়েছে।এই বিমলা যখন একদিকে পৌরুষের অন্বেষণে আর অন্যদিকে স্বদেশপ্রেমের হুজুগে মত্ত তখনই তার সামনে এসে দাঁড়ায় সন্দীপ। যার মধ্যে সে খুঁজে পায় পৌরুষের তেজ আর দেশ ভক্তির উন্মত্ততা।আসলে স্বামী ভক্তিকে প্রেম বলে ভুল করেছিল বিমলা। প্রকৃত প্রেম সেটা ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখানেই ছিল একটা মস্ত ফাঁক ।যার মধ্যে দিয়ে সন্দীপ সহজেই বিমলা নিখিলেশের দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করেছিল।

সন্দীপের দৃপ্ত ভাষণে, দেশমাতৃকার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের আহবানে, তার আদর্শ নায়ককে খুঁজে পেয়েছিল।তার দাম্পত্য জীবনে ফাঁক না থাকলে কখনোই তা সম্ভব হতো না।

সন্দীপের কথায় মোহিত হয়ে এবং বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দিতে চেয়ে তার মন দ্বিবিধ পথে ধাবিত হয়েছে। সন্দীপ যখন বিমলা কে বলেছে 'অন্নপূর্ণা','আগুনের সুন্দরী দেবতা' তখন নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে পতঙ্গের মতো বহ্নির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিমল সন্দ্বীপকে স্পষ্ট জানিয়েছে সে দেশকে প্রকৃতভাবে ভালবাসতে চায়-----

"আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব,দেবী বলব, দুর্গা বলব,যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব।আমি মানুষ দেবতা নই"।

অন্দরমহলে বিমলা যোগ্য অভিনন্দন পাইনি বলে বাহির মহলে সে সন্দীপের দেশপ্রেমের বন্যায় ভেসে গেছে। কিন্তু সন্দীপের দেশ উদ্ধারের নামে অর্থ সংগ্রহের পিপাসা বিমলার সামনে সন্দীপ এর আসল রূপটা খুলে দিয়েছে। আত্ম দংশনে ক্ষতবিক্ষত বিমলা বলেছে--- "আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি---এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না,দেশও হয়ে গেল পর।"

সন্দীপের মোহ মুক্ত হলো বিমলা। তারপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অমূল্য প্রাণ হারালো এবং নিখিলেশ গুরুতর আঘাত পেল। নিখিলেশের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে নতুন করে সবকিছু শুরু করার সুযোগ পেল না। তার পাপের স্থান থেকেই প্রায়শ্চিত্ত শুরু হল। নিখিলেশের প্রেমের সত্যতা উপলব্ধি করল বিমলা। তার প্রেম ভক্তির স্তর পেরিয়ে দাম্পত্য প্রেমের সত্যতায় প্রবেশ করল। ভাঙ্গা মন ও জীবনের বহু অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত নিখিলেশ বিরহীর বিশ্বাস নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার আশা কে বাঁচিয়ে রেখেছে-----

" সামনে যে বাঁশি বাজবে কান দিয়ে যদি শুনি তো শুনতে পাই বিচ্ছেদের সমস্ত ফাটলগুলো ভেতর দিয়ে তার মাধুর্যের ঝরনা ঝরে পড়ছে। লক্ষীর অমৃত ভান্ডার ফুরোবে না বলেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন"।

উপন্যাসের নায়ক নায়িকা অন্দরমহল থেকে বাহির মহলে গিয়ে আবার অন্দরমহলে ফিরে এসেছে। তবেই ফিরে আসার মধ্যে তাদের যেমন অন্তরের সত্য উপলব্ধি হয়েছে,নিজের বিশ্বাস জিতে গেছে,তেমনি সমকালীন রাজনীতি ও প্রেমের বিশুদ্ধ অস্তিত্বের পর্যায়ে তারা উন্নীত হয়েছে।

৭.৪ উপন্যাসে বিমলার মনস্তত্ত্ব

ইতিপূর্বেই ঘরে বাইরে উপন্যাসের অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঘরে বাইরে উপন্যাস যে মূলত সন্দীপ নিখিলেশের জীবনের টানাপোড়েনের দলিল তা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এই যে উপন্যাসের ঘটনাবলী তার পশ্চাতে একটি বিষয়ই মূলত দায়ী। তা হল চরিত্র গুলির জটিল মনস্তত্ত্ব। অদ্ভুত মানসিক টানাপোড়েন চরিত্রগুলি যেমন জটিল হয়েছে তেমনি তাদের জীবন বিভিন্ন ওঠাপড়া মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের একটা নিজস্ব আদর্শ,জীবনের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটা দৃঢ় মানব চেতনা রয়েছে। অন্যদিকে বিমল আর জীবনে মনস্তত্ত্বের সবচেয়ে বেশি পর্যায়ক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে। নিখিলেশের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সন্দীপের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছানো এবং আবার সন্দীপের কেন্দ্রবিন্দু থেকে নিখিলেশের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসা। তার এই জীবনের এই পর্যায়ক্রম কে পরিচালনা করেছে তার জটিল মনস্তত্ত্ব। বিমলার মনস্তত্ত্ব আলোচনার প্রসঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব

কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মানব মনের অবদমিত কামনা বাসনা প্রকাশ করার জায়গা হলো মন। যেখানে মনের সচেতন সচেতন এবং অবচেতন তিনটি স্তরই বর্তমান থাকে। এই ত্রিবিধ মনের চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব মনকে আন্দোলিত করে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সামাজিক জীবনে। যার ফলে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে বসবাসকারী মানুষের মধ্যেও এক অদৃশ্য ফাঁক অজান্তেই তৈরি হয়ে যায়। বিমলা এবং নিখিলেশের ক্ষেত্রে সেটি হয়েছিল।

মনস্তাত্ত্বিক প্রথম স্তরে বিমলা মধ্যে দেখা যায় ভারতীয় নারীর সনাতন ঐতিহ্যকে। যা সে তার মায়ের কাছ থেকে জন্মসূত্রে লাভ করেছিল। আত্মকথায় সে বলেছে-----

" সুন্দরী তো নই,কিন্তু মায়ের মত যেন সতীর যশ পাই, দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল,এ মেয়ে সুলক্ষণা,সতীলক্ষী হবে।"। বিমলার শ্বশুরবাড়িতে ব্যক্তিস্বাধীনতায় কেউ কখনো হস্তক্ষেপ করেনি।স্বামী নিখিলেশ যথেষ্ট আধুনিক, উদার।বিমলা স্বামী ভক্তি পরায়ণা। উপন্যাসের প্রথমে বিমলার আত্মকথায় তাকে সাধারণ বাঙালি তথা ভারতীয় নারীর মত স্বামী ভক্তি পরায়ন হিসেবেই দেখা যায়। স্বামীকে ভক্তি করা,পুজো করা তার কাছে একটা সংস্কার। তাই স্বামীর ফটোতে ওর চিঠিতে সে ফুল দিয়ে পুজো করেছে----

"একটি চন্দন কাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তার চিঠিগুলো রাখতুম, আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম"। বিমলার আত্মকথায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তার এই ভক্তির কথা। কখনো সে বলেছে---"মেয়ে মানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও এমনি সহজ কথা।" আবার কখনো সে বলেছে---- "আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল সে ভক্তি করবার ব্যগ্রতা"। আসলে ভক্তির এই সুর সে লাভ করেছিল তার মায়ের থেকেই। কিন্তু প্রকৃত প্রেম সেখানে ছিল না। বিমলা কেবল এই ভক্তি কে প্রেম বলে জেনেছে ও মেনেছে।

আর তার এই ভক্তি থেকেই তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল সতীত্বের অহংকার। বিমলা নিজেই সে কথা স্বীকার করেছে---

"তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের।সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে, এটা আমার মনে ছিল"। তবু মেজো জায়ের প্রতি তার মন সন্দিগ্ধ হয়েছে।

নিখিলেশের জীবন দর্শন ছিল বিমলার বোধগম্যের বাইরে। তাই বল প্রয়োগে,জোরজবরদস্তিতে বিশ্বাসহীন,মুক্তচিত্ত,উদার নিখিলেশ বিমলার চোখে ছিল পৌরুষের তেজহীন পুরুষ। বিমলা নিজে সেই কথা স্বীকার করেছে----

"সত্য কথা বলব?অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি,আর--- একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।" "আমার মনে হতো, ভালো হবার একটা সীমা আছে,যেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়।"

আসলে বিমলার মনে যে রাজপুত্তুরের স্বপ্ন ছিল নিখিলেশের মধ্যে দিয়ে সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি বিমলার। সে জানিয়েছে---

"ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে-সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাগ্র মনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মতো, যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন-কি, তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় না হয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখতে পেলুম না কেন"?আর এই যে চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান সেটাই তাকে ধাবিত করেছে সন্দীপের দিকে। নিখিলেশের সঙ্গে দিন যাপনের সময় বিমলার মনে যে অবদমিত কামনা বাসনা জন্ম নিয়েছিল সন্দীপকে দেখে সেটারই বহিপ্রকাশ ঘটল। নিখিলেশ চেয়েছিল বিমলা কেবল গৃহবন্দি হয়ে না থেকে বাইরের জগতে এসে নিখিলেশ কে চিনে নিক,সেখানেই তাদের ভালোবাসার আদান প্রদান হোক।নিখিলেশ বলেছে----

"এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে। তুমি যে কাকে চাও জানো না, কাকে পেয়েছ তাও জানোনা।...তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্য তুমিও হও নি, আমিও হইনি।সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা

সার্থক হবে।"কিন্তু বাইরের জগতে পা রেখে বিমলা ক্রমশ নিখিলেশের থেকে দূরে সরে গেছে এবং সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার কাছাকাছি পৌঁছতে চেয়েছে।সন্দীপের প্রচন্ড দেশপ্রেম, স্বদেশী আন্দোলনের অদম্য উৎসাহ এবং তার বাকচাতুর্য তার প্রতি মোহগ্রস্ত করে তুলেছে। সন্দীপের প্রতি আকর্ষণ বিমলার যত বেড়েছে ততই সন্দীপের পাশে নিখিলেশকে তার ম্লান মনে হয়েছে।নিখিলেশ বিমলার ওপরে কখনো কোন বিষয়ে জোর ফলায় নি। কারণ তা নিখিলেশের আদর্শ বিরোধী। নিখিলেশ বিশ্বাস করে---

"আস্ত পাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো।নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানো টাও ভালো।"

কিন্তু নিখিলেশের এসব কথার গভীরতা বিমলা বোঝেনা, এমনকি এসব কথা বোঝবার ধৈর্যও তার নেই। কিন্তু বিমালা কে ঘর থেকে বাইরে বের করে আন বার একটানে সাজানো নিখিলেশ কে পেয়ে বসেছিল। তার মতে---"মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্ত রূপে সত্যরূপেই দেখতে চাই,তাহলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিন্ত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়"। বিমলার অন্তরের টান ছিল প্রচন্ডতার ওপর।তাই সন্দীপের প্রতি আকর্ষণ তার গভীর হয়েছে।মনস্তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে এজন্যই বিমলা প্রবেশ করেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই নিখিলেশের কেন্দ্র থেকে ক্রমশ সরে গিয়েছে সন্দীপের কেন্দ্রবিন্দুতে। আর নিখিলেশের সঙ্গে ব্যবধান ক্রমশ বেড়েছে।সন্দীপের দৃপ্ত ভাষণে, দেশমাতৃকার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের আহবানে, তার আদর্শ নায়ককে খুঁজে পেয়েছিল বিমলা।তার দাম্পত্য জীবনে ফাঁক না থাকলে কখনোই তা সম্ভব হতো না।

সন্দীপের কথায় মোহিত হয়ে এবং বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দিতে চেয়ে তার মন দ্বিবিধ পথে ধাবিত হয়েছে। সন্দীপ যখন বিমলাকে বলেছে 'অন্নপূর্ণা','আগুনের সুন্দরী দেবতা' তখন নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে পতঙ্গের মতো বহ্নির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিমলা সন্দীপকে স্পষ্ট জানিয়েছে সে দেশকে প্রকৃতভাবে ভালবাসতে চায়। যেমন ভাবে মানুষ নিজের লোভ প্রকাশ করে থাকে তেমন ভাবে বিমলা দেশকে নিজের লোভের এবং অংকারের বস্তু ভেবে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে।শুধু লোভ নয় দেশের প্রতি যে মোহ আছে সেটুকুও বিমলা প্রয়োগ করবে দেশের কাজ করে -

"আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব,যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব।আমি মানুষ দেবতা নই"।

অন্দরমহলে বিমলা যোগ্য অভিনন্দন পায়নি বলে বাহির মহলে সে সন্দীপের দেশপ্রেমের বন্যায় ভেসে গেছে। তার অবস্থান সন্দীপের সত্যতা কোন কিছুই বিবেচনা করে সে দেখেনি। বরঞ্চ স্বদেশী ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের জীবন ধারণের ধরন সে বদলে ফেলেছে।তার মনে দেশ ভক্তির আগুন জ্বলে উঠেছে।সে অনুভব করেছে---"রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য"। সন্দীপ এর কাছে আসা নানা ধরনের চিঠি বিমলা পড়ে,স্বদেশীর নানা বিষয়ে সে তর্কও করে সন্দীপের সঙ্গে।স্বদেশী বিমলার মনে যে প্রভাব ফেলেছিল তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবেগ তাড়িত বিষয় বলেই মনে করেছেন। বিমলা নিজেও স্বীকার করেছে যে সন্দীপের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া দেশপ্রেম আবেগ কিন্তু বিমলার দেশভক্তির মূলে আঘাত করলো সন্দীপের বাক্যালাপ, তার চাহনি, তার ইচ্ছা। সে বলেছে ---

"তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়। তার চোখের চাহনি যেন আমার পায়ে ধরে।অথচ তাদের মধ্যে এমন একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতের মতো আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।" যারা দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে তারা কখনও স্বার্থপর লোভী স্বভাবের হয় দেশকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করে সেটা ছিল বিমলার কল্পনার অতীত।বিমলার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের আর এক স্তর শুরু হয়েছিল সন্দীপ যগন তাকে "অন্নপূর্ণা"-র স্থান থেকে নামিয়ে এনে "মক্ষীরানী" করে তুলেছিল। সন্দীপের অসংকোচ অহংকারে নিজেকে ধরা দিয়েছে বিমলা। দেশ সেবার নামে সন্দীপ ধীরে ধীরে বিমলাকে মডার্ণ কালের স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় উৎসাহিত করতে চেয়েছে। কিন্তু বিমলা সন্দীপের আসল উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারেনি।বারবার সন্দীপের দেশভক্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাকে বেঁধে রেখেছে অদৃশ্য বন্ধনে। কিন্তু এই বন্ধন বেশি টেঁকেনি।সন্দীপের দেশ উদ্ধারের নামে অর্থ সংগ্রহের পিপাসা বিমলার চোখ খুলে দিয়েছে। অমূল্যর মত তরতাজা প্রাণ এর মধ্যে সন্দীপ এর প্রভাব থেকে সে স্তম্ভিত হয়েছে। নিজের সতীত্ব কে বাঁচিয়ে রাখবার দ্বন্দ্ব অন্যদিকে মাতৃত্বের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে বিমলার জীবনে।ভন্ড দেশপ্রেমিকের হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেওয়ার জন্য বিমলা নিজের ঘরে চুরি করেছে।আত্ম দংশনে ক্ষতবিক্ষত বিমলা বলেছে--- "আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি--- এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না,দেশও হয়ে গেল পর।"

এরপর তৃতীয় পর্যায়ে বিমলার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চরম হয়েছে। কারন সে একদিকে সন্দীপকে তার দেখানো পথকে পরিত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।অন্যদিকে নিখিলেশ এর কাছে ফিরে আসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চেয়েছে। বিমলার প্রতি মিথ্যে স্তুতি করে সন্দীপ তার মন ভুল দিয়েছে।মধুর স্বাদকে শরীরে মনে ধারণ করবার আশায় বিমলা নিমগ্ন ছিল দীর্ঘদিন।সে ঘোর কেটে যাওয়ার পরে বিমলা বলেছে----

"আমি আগুনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।যা পোড়ার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।যা বাকি আছে তার মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম,তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধ কে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।"

এবার বিমলার আবার নিখিলেশের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসার পর্ব।সে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় নিখিলেশের পদাশ্রয় লাভ করে।বাইরের জগত যে কত কঠিন,কত জটিল,কত নির্মম তা নিজের জীবন দিয়ে বিমলা বুঝেছে।আর এটাও বুঝেছে প্রকৃত দেশপ্রেমের,প্রকৃত বিপ্লবের আদর্শ কি হওয়া উচিত।শুধু তাই নয় মানসিক দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত,অসহায়,আশ্রয়হীন বিমলা মাটির উপরে লুটিয়ে কেঁদেছে। সে বলেছে ---"এমন একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই,একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস ,একটা এমন আশ্বাস যেসব চুকে যেতেও পারে"এবং সর্বোপরি সেই ক্ষমা,আশ্রয়,আশ্বাস সে নিখিলেশের কাছ থেকেই পেয়েছে।ক্রন্দনরতা বিমলার মাথায় নিখিলেশ হাত বুলিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছে।আর বিমলা নিখিলেশের পা বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে সমস্ত ভার লাঘব করতে চেয়েছে। সে নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে চেয়েছে।তাই বিধাতাকে উদ্দেশ্য করে সে বলেছে----"সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি করো।নইলে আমি আর কোন উপায় দেখিনে।"আসলে বিমলা নিখিলেশের প্রেমের সত্যতা,গভীরতা উপলব্ধি করেছে।তাই তার কাছেই আবার ফিরে আসতে চেয়েছে।নিখিলেশের উদারতা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বিমলার কাছে কেবল ভক্তি নয় প্রকৃত প্রেম হয়েই শেষ অবধি ধরা দিয়েছে। নিখিলেশের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে বিমলা সবকিছু নতুন করে শুরু করতে চেয়েছে। এতদিন সে জীবনের প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছে। নিখিলেশ এর প্রতি ভক্তি স্তর পেরিয়ে সত্য প্রেমের পথ ধরেছে। পথভ্রষ্ট হয়ে সে যা ভুল করেছিল তার যথেষ্ট মূল্যই তাকে দিতে হয়েছে। আর এই মহামূল্যবান সম্পদকে সে হারাতে চায়না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাওয়া তার হয়নি।যে অমূল্যকে বিমলা মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিল,ভেবেছিলো ---"জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে

আমার কোলে এসো এই বর আমি কামনা করি"। সেই অমূল্য মুসলমানদের অত্যাচার রুখতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। আর নিখিলেশ মাথায় চোট নিয়ে ফিরে এসেছে। নিখিলেশের কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে সন্দীপের কেন্দ্রে প্রবেশ করে যে পাপ করেছে,ছদ্ম স্বদেশপ্রেমের ভন্ডামীতে ভুলে সে যে ভুল করেছে,তার প্রায়শ্চিত্ত তাকে তার পাপের স্থান থেকেই করতে হবে। অমূল্যর মৃত্যু এবং নিখিলেশের চোট এই ঘটনার মধ্য দিয়েই তার প্রায়শ্চিত্ত সূচনা হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই পাপের গণ্ডি পেরিয়ে প্রায়শ্চিত্তের গন্ডিতে প্রবেশ করতে পেরেছে খুঁজে পেয়েছে জীবনধারণের সত্য এবং সঠিক রসদ। প্রকৃত প্রেম কে চিনে নিতে পেরেছে সে।বিমলার জীবনের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন শ্লথ হয়েছে উপন্যাসের শেষে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১.ঘরে বাইরে উপন্যাসের নামকরণ কোন দিক থেকে সার্থক?

উত্তর-উপন্যাসটি একটি গভীর ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছে আমাদের সামনে।সেই কারণেই উপন্যাসের ব্যঞ্জনা ধর্মী নামকরণ 'ঘরে বাইরে' একেবারেই সার্থক হয়ে ওঠে।

২. ঘরে বাইরে উপন্যাসের কোন চরিত্র ঠিক সবচেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গেছে?

উত্তর- ঘরে বাইরে উপন্যাসের নায়িকা বিমলা সবচেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের সম্মুখীন হয়েছে।

৩. ঘরে বাইরে উপন্যাসে সন্দীপের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে নিখিলেশের সম্পর্কে বিমলার ধারণা কিরূপ ছিল?

উত্তর-নিখিলেশের জীবন দর্শন ছিল বিমলার বোধগম্যের বাইরে। তাই বল প্রয়োগে,জোরজবরদস্তিতে বিশ্বাসহীন,মুক্তচিত্ত,উদার নিখিলেশ বিমলার চোখে ছিল পৌরুষের তেজহীন পুরুষ। বিমলা নিজে সেই কথা স্বীকার করেছে-

"সত্য কথা বলব? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি,আর--- একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।" "আমার মনে হতো, ভালো হবার একটা সীমা আছে,যেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়।"

৭.৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঘরে বাইরে উপন্যাসের নামকরণ টি সার্থক?---ব্যাখ্যা করো।

২. ঘরে বাইরে উপন্যাসে নায়িকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করো।

৩. ঘরে বাইরে উপন্যাসের চরিত্র গুলির মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রেমের চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা লেখ।

৪. ঘরে বাইরে উপন্যাসে রাজনৈতিক সত্য ও প্রেমের সূত্র একই সূত্রে বাঁধা কথাটির সত্যতা বিচার করো।

৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন।

২. ঘরে-বাইরে- ড.গোকুলানন্দ মিশ্র।

৩. রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা- সত্যব্রত দে

৪. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫.বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা- শ্রী ভূদেব চৌধুরী

৬. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস- অমরেশ দাস

৭.উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি- উজ্জ্বল কুমার মজুমদার